Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দ্বীনি ইলম অর্জন করার গুরুত্ব, ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাইমা জাহান

রোলঃ ২৩১০০১২০৫৫৩

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দ্বীনি ইলম অর্জন করার গুরুত্ব, ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাইমা জাহান

রোলঃ ২৩১০০১২০৫৫৩

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " দ্বীনি ইলম অর্জন করার গুরুত্ব, ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাইমা জাহান, আইডিঃ ২৩১০০১২০৫৫৩ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " দ্বীনি ইলম অর্জন করার গুরুত্ব, ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

নাইমা জাহান

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

নাইমা জাহান

আইডিঃ ২৩১০০১২০৫৫৩

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১) মৌলিক টপিক.....6
ইলমের পরিচয় : 6
ইলমের তাৎপর্য :.....9
ইসলামে ইলমের গুরুত্ব:.....10
ইলম ও মানবজীবনের সম্পর্ক:.....17
ইলমের মাহাত্ম্য:.....19
২)কোরআন ও হাদিসভিত্তিক টপিক.....22
কোরআনের আলোকে ইলমের মর্যাদা:.....22
হাদিসে ইলম অর্জনের ফজিলত:.....24
প্রথম ওহীতে ইলমের গুরুত্ব :.....26
নবীদের জীবনে জ্ঞানের ভূমিকা:.....28
সাহাবীদের ইলম অর্জনের উদাহরণ:.....32
৩) ইলমের শ্রেণীবিভাগ ও আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা.....35
ফরজে আইন ও ফরজে কিফায়া ইলম:.....35
দ্বীনি ও দুনিয়াবি ইলমের পার্থক্য:.....38
আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ও ইসলামী শিক্ষা:.....44
৪) ব্যক্তিগত জীবনে ইলমের প্রভাব.....47
ইলম কিভাবে ব্যক্তিত্ব গঠন করে:.....47
ইলম ও আত্মশুদ্ধি:.....49
ইলম ও ধৈর্যশীলতা:.....51
ইলম ও তাকওয়া:.....54
জ্ঞানহীনতার ক্ষতি:.....56
৫) ইলম অর্জনের ফজিলত (বিশেষ টপিক).....60

ইলম অর্জনকারী বা তালিবুল ইলমের মর্যাদা: 60
আলেমদের মর্যাদা: 63
ফেরেশতাদের দোয়া ও জ্ঞানী ব্যক্তির সম্মান: 67
ইলম ও আমলের সমন্বয়: 70
৬) ইলম অর্জনের পদ্ধতি ও শিষ্টাচার 74
ইলম অর্জনের আদব: 74
ইলম অর্জনের নিয়ত: 78
পড়ার নিয়মবিধি: 80
ইলম অর্জনের সময় সম্পর্কে: 84
চেষ্টা, অধ্যবসায় ও দৃঢ় সংকল্প: 87
৭) সমসাময়িক ও আধুনিক টপিক 92
ডিজিটাল যুগে ইলম অর্জন: 92
পিডিএফ ভার্সনের বই: 95
আধুনিকতা ও ইলমের দূরত্ব: 97
প্রযুক্তিনির্ভর ইলম অর্জনের বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ: 100
৮) ইলম, সময় ও অনীহা 103
জ্ঞান অর্জন সম্পর্কে: 103
ইলম অন্বেষণে বিমুখতা: 106
অবসরতা হচ্ছে গনিমত: 108
পরিশেষে: 111

১) মৌলিক টপিক

ইলমের পরিচয় :

ইলম হচ্ছে জাহল (অজ্ঞতা) এর বিপরীত। আর ইলমের অর্থ হলো কোনো কিছুকে তার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে, সঠিকভাবে, স্পষ্টভাবে এবং সন্দেহমুক্তভাবে জানতে পারা।

অর্থাৎ ইলম শুধু মুখে বলা বা শুনে নেওয়া নয়; বরং এমন এক জ্ঞান যা অন্তরে বিশ্বাস সৃষ্টি করে, মস্তিষ্কে সঠিক ধারণা দেয় এবং জীবনে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

কিছু বিদ্বান বলেছেন, ইলম হলো কোনো কিছুর প্রকৃত অবস্থা জানা। আর এটি অজানা ও অজ্ঞতার বিপরীত। আবার অন্য কিছু বিদ্বানগণ বলেছেন, নিশ্চয়ই ইলম কেবল জানা নয়; বরং এটি এমন এক সুস্পষ্ট উপলব্ধি, যা সন্দেহ, বিভ্রান্তি এবং অজ্ঞতার অন্ধকারকে সম্পূর্ণভাবে দূর করে দেয়।

আর ইলমের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এটি মানুষের চিন্তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করে।

আর এখানে ইলম দ্বারা আমাদের যেটি উদ্দেশ্য সেটি হলো ইলমে শারঈ (ইসলামী জ্ঞান)।
ইলমে শারঈ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যেসব সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ, হিদায়াত, বিধান এবং নির্দেশনা অবতীর্ণ করেছেন, সেগুলোর জ্ঞান অর্জন করা, সেগুলো সঠিকভাবে বোঝা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা।

অর্থাৎ, ইলমে শারঈ শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান নয়; বরং এটি এমন একটি জ্ঞান যা মানুষের আকিদা (বিশ্বাস), ইবাদত, আখলাক (চরিত্র) এবং সমাজ জীবনের প্রতিটি অংশকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলে।

সুতরাং, যে ইলমের মাঝে গুণকীর্তন, প্রশংসা ও মর্যাদা রয়েছে, সেটিই হলো ওহীর জ্ঞান এবং একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত ইলম।
এই ইলম আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে দান করেন। এটি কোনো সাধারণ অর্জন নয়, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ তাওফিক।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,
"আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন।"
(সহিহ বুখারি – ৭১, সহিহ মুসলিম – ১৩৩৭)
এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, ইলমে দ্বীন অর্জন করা আল্লাহর বিশেষ রহমত ও হিদায়াতের একটি বড় নিদর্শন। যার অন্তরে এই ইলম আসে, তার জীবন ধীরে ধীরে সঠিক পথে পরিচালিত হয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,
"নিশ্চয়ই নবীগণ কাউকে দিনার ও দিরহামের উত্তরাধিকারী বানাননি। প্রকৃতপক্ষে তারা মানুষকে ইলমের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করে, সে নবীগণের উত্তরাধিকার থেকে পূর্ণ অংশ অর্জন করে।"
(তিরমিজি – ২৬৮২, আবু দাউদ – ৩৬৪১, ইবনে মাজাহ – ২২৩)

এই হাদিস থেকে স্পষ্ট হয় যে, নবীদের রেখে যাওয়া সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো ইলম। আর যারা এই ইলম অর্জন করে, তারা নবীদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নবীগণ মানুষকে যে ইলমের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে এটি হলো আল্লাহর শরীয়ত সংক্রান্ত ইলম।
অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞান, সুন্নাহর জ্ঞান হালাল-হারাম সম্পর্কিত জ্ঞান, ইবাদত ও আকিদার জ্ঞান। এই জ্ঞানই মূলত নবীদের উত্তরাধিকার।
নবীগণ মানুষকে কারিগরি বিদ্যা, শিল্পকর্ম, কৃষি বা দুনিয়াবি পেশাগত দক্ষতার উত্তরাধিকারী বানাননি। এসব জ্ঞান মানুষের অভিজ্ঞতা, প্রয়োজন ও সময়ের সাথে অর্জিত হয়।

তবে দুনিয়াবি জ্ঞানকে ইসলামে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয়নি। বরং এটি মানুষের জীবনের প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
এর বাস্তব উদাহরণ পাওয়া যায়।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় আগমন করে কিছু লোককে খেজুর গাছে পরাগায়ন করতে দেখলেন। তিনি তাদের একটি পরামর্শ দিলেন। তারা তা মেনে নিয়ে পরাগায়ন বন্ধ করে দিল। কিন্তু পরে দেখা গেল, ফলন কমে গেছে।
তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,
"তোমরা তোমাদের দুনিয়াবি বিষয়গুলো সম্পর্কে অধিক জ্ঞানের অধিকারী।"
(সহিহ মুসলিম – ২৩৬৩)
এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, কিছু দুনিয়াবি বিষয় মানুষের অভিজ্ঞতা, গবেষণা এবং বাস্তব জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল।

যদি এই ধরনের দুনিয়াবি অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানই প্রকৃত প্রশংসিত ইলম হতো, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই সর্বাধিক জ্ঞানী হতেন সব বিষয়ে।
কিন্তু বিষয়টি তা নয়। বরং ইলমের মধ্যে মূল ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদা হলো ইলমে শারঈ।
এই কারণেই আল্লাহ তাআলা কুরআনে বহু জায়গায় ইলম ও আলেমদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

যে ইলমের মাঝে প্রকৃত প্রশংসা, মর্যাদা এবং আখিরাতের সফলতা রয়েছে, সেটিই হলো ইলমে শারঈ (ইসলামী জ্ঞান)।

এটি আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ বোঝার জ্ঞান। আর অন্যান্য ইলম কখনো উপকারী,কখনো প্রয়োজনীয়, আবার কখনো পরিস্থিতি অনুযায়ী মাধ্যম মাত্র। অতএব, প্রত্যেক ইলমের মূল্য তার উদ্দেশ্য, ব্যবহার এবং ফলাফলের উপর নির্ভর করে। (কিতাবুল ইলম)

ইলমের তাৎপর্য :

ইলম (জ্ঞান) হলো আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে আগত কল্যাণময় 'হিকমা'। এটি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম এবং আমলের নূর। ইলম মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে, তাকে হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করে এবং তার জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। ইলমের অর্থ হলো প্রকৃত আলিমদের অনুসরণ করা এবং শরীয়তের বিধানগুলো কুরআন-সুন্নাহযথাযথভাবে জানা, যা মানুষের অন্তরে গভীরতা, খুশু' ও আমলের নূর সৃষ্টি করে। ইলম এমন এক সম্পদ যা দুনিয়াতে মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং আখিরাতে মুক্তির পথ সুগম করে। (মাসিক আল কাউসার)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজ। তবে জেনে রাখা জরুরি সব ধরনের জ্ঞান অর্জন সবার জন্য ফরজ নয়; বরং যে জ্ঞান দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য, সেটাই ফরজ। কারণ বলা হয়েছে, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান হলো উপস্থিত প্রয়োজনীয় জ্ঞান, এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আমল হলো দৈনন্দিন জীবনে শরীয়তবিরোধী বিষয় থেকে নিজেকে হেফাজত করা। এ জ্ঞান মানুষের আমলকে শুদ্ধ করে এবং তাকে গুনাহ থেকে বাঁচার শক্তি দেয়।

মুসলমান যখন যে বিষয়ের সম্মুখীন হয়, তখন সেই বিষয়ের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা তার উপর ফরজ হয়ে যায়। যেমন: নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক। অতএব নামাজ আদায় করতে গিয়ে যে সকল কাজ তাকে করতে হয়, সে সকল বিষয়ের এতোটুকু জ্ঞান অর্জন তার জন্য ফরজ, যতটুকু দ্বারা নামাজের ফরজ বিষয়গুলো শুদ্ধভাবে আদায় করা যায়। আর এতোটুকু জ্ঞান অর্জন করা তার জন্য ওয়াজিব, যতটুকু দ্বারা নামাজের ওয়াজিবগুলো যথাযথভাবে আদায় করা সম্ভব হয়। কারণ যে সকল বিষয় ফরজ আদায়ের উপায় হিসেবে সাব্যস্ত হয়, সে সকল বিষয় অর্জন করা ফরজ। আর যে সকল বিষয় ওয়াজিব আদায়ের মাধ্যম হিসেবে সাব্যস্ত হয়, তা অর্জন করাও ওয়াজিব।

এছাড়াও, ইলম মানুষের চরিত্র গঠন করে, তাকে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি শেখায়। ইলম ছাড়া ইবাদত অনেক সময় ভুল ও অপূর্ণ থেকে যায়, কিন্তু ইলমের মাধ্যমে ইবাদত পরিপূর্ণতা লাভ করে। ইলম মানুষকে অহংকার থেকে দূরে রাখে এবং বিনয়ী

হতে শেখায়, কারণ প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি জানে যে, তার জ্ঞান সীমিত এবং আল্লাহর জ্ঞান অসীম।

অনুরূপভাবে রোজা, যাকাত ও হজের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য। যদি কারো উপর রোজা ফরজ হয়, তবে রোজার মাসায়েল জানা তার জন্য ফরজ। যদি তার নেছাব পরিমাণ সম্পদ থাকে, তবে যাকাতের বিধান জানা তার জন্য আবশ্যক। আর যদি হজ তার উপর ফরজ হয়, তবে হজের নিয়ম-কানুন শেখা তার জন্য অপরিহার্য। এভাবে লেনদেনের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য। যদি কেউ ব্যবসায়ী হয়, তবে তার জন্য হালাল-হারাম, সুদ, প্রতারণা ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ, যাতে সে বৈধ উপার্জন করতে পারে এবং অন্যের হক নষ্ট না করে। (তালিমুল মুতাল্লিম)

সর্বোপরি, ইলম হলো এমন এক নূর, যা মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে হিদায়াতের পথে পরিচালিত করে। যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে, সে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত প্রয়োজনীয় ইলম অর্জনে যত্নবান হওয়া এবং তা নিজের জীবন ও সমাজে বাস্তবায়ন করা।

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব:

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম ও মৌলিক। ইসলামের প্রথম ও সর্বপ্রথম বার্তাই ছিল

اِقْرَأْ অর্থ পড়, ইলম অর্জন কর।

এটি প্রমাণ করে যে, ইসলামের সূচনা থেকেই জ্ঞান অর্জনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইসলামকে ইলম থেকে আলাদা করা অসম্ভব; বরং ইসলাম নিজেই ইলমভিত্তিক একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলামের প্রতিটি অংশের মধ্যেই ইলম বিরাজমান।

ইলম ছাড়া যথাযথভাবে ইসলাম পালন করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন কিংবা রাষ্ট্রীয় জীবনকোনো ক্ষেত্রেই সঠিকভাবে ইসলাম বাস্তবায়ন করা যায় না যদি ইলম না থাকে। কারণ সঠিক জ্ঞান ছাড়া সঠিক আমল অসম্ভব।

তাবেঈ উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহিমাহুল্লাহ বলেন,

من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করবে সে সঠিকভাবে যতটুকু করবে না করবে, বরবাদ করবে তার চেয়ে বেশি। (তারীখে তাবারী ৬/৫৭২)

দ্বীনি ইলমের বিভিন্ন স্তর ও ভাগ রয়েছে। একটি ভাগ ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়া হিসাবে। ফরযে আইন বলা হয়, যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। বিশেষভাবে এই প্রকারের ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরয। (সুনানে ইবনে মাজাহ – ২২৪)

ঈমান-আকীদা, ইবাদাত-বন্দেগী, মুআমালাত-মুআশারাতসহ ইসলামের বড় বড় সকল অধ্যায়ের অনেক বিষয়ই এই প্রকারের ইলমের মধ্যে শামিল, যা সকলকেই শিখতে হবে। এই পরিমাণ ইলম শিখে নেওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য। আর অধীনস্তদেরকে শিক্ষা দেওয়াও জরুরি। এ পরিমাণ ইলম না শিখলে আল্লাহর কাছে অন্যকে দায়ী করা যাবে না এবং কোনো ওজরও গ্রহণযোগ্য হবে না।

দ্বিতীয় প্রকারের ইলম হচ্ছে, ফরযে কেফায়া, যা স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয না হলেও সামষ্টিকভাবে সকলের উপর ফরয। অর্থাৎ সমাজের কিছু ব্যক্তি তা হাসিল করলে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। আর কেউই হাসিল না করলে সকলেই দায়ী থাকবে। এ প্রকারের ইলম অনেক বিস্তৃত। এককথায় দ্বীনের সকল বিষয়ের গভীর জ্ঞান। যেহেতু এটি সামষ্টিকভাবে সকলের উপরই ফরয তাই সকলকেই এই দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন থাকা চাই। কেউ যেন মনে না করে, এটি কেবল অমুক শ্রেণির দায়িত্ব। এই ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ.

এই ইলমকে ধারণ করবে প্রত্যেক উত্তর প্রজন্মের আস্থাভাজন শ্রেণি। তাঁরা একে মুক্ত রাখবে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি থেকে, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার থেকে এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে। (শরহু মুশকিলিল আছার, হাদীস, ৩৮৮৪; শারাফু আসহাবিল হাদীস, খতীব বাগদাদী, পৃ. ২৯; বুগইয়াতুল মুলতামিস)

ইলমকে বলা হয় মাওকূফ আলাইহি অর্থাৎ দ্বীনের প্রতিটি আমল এর উপর নির্ভরশীল। ইমাম বুখারী রাহ. সহীহ বুখারীতে একটি শিরোনাম দিয়েছেন,

باب العِلمِ قبْلَ القوْلِ والعمل.

(সকল কথা ও আমলের আগে হচ্ছে সেই বিষয়ের ইলম।)

এই কারণে হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, যে আমলের যে হুকুম তার ইলম হাসিল করারও একই হুকুম। অর্থাৎ যেই আমলটি ইসলামে ফরয তার ইলম অর্জনও ফরয। যেটা ওয়াজিব তার ইলম অর্জন করাও ওয়াজিব। যেটা সুন্নত তার ইলম অর্জনও সুন্নত। তদ্রপ যেটা হারাম তার ইলম অর্জন করা ফরয। যা মাকরূহে তাহরীমী তার ইলম অর্জন করা ওয়াজিব। এককথায় ইসলামের যেই বিষয়টি যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়ের ইলম অর্জন করাও তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সঠিক ইলম ছাড়া সঠিক আমল কখনোই সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআনের পুরোটাই ইলম। কুরআন শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া, কুরআনের তালীম দেওয়া সবকিছুই ইলম চর্চার মধ্যে শামিল। কুরআনকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে যত জায়গায় বলা হয়েছে তার মধ্যে কুরআনের ইলম অর্জন করার বিষয়টি আবশ্যকীয়ভাবেই অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের ইলম অর্জনের গুরুত্ব কুরআনের মতই। কারণ আল্লাহ পাক কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে আমরা এর ইলম অর্জন করি এবং সেই অনুযায়ী আমল করি। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন-

وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে। (সূরা নাহল – ৪৪)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

هُوَ الَّذِیۡ بَعَثَ فِی الۡاُمِّیّٖنَ رَسُوۡلًا مِّنۡهُمۡ یَتۡلُوۡا عَلَیۡهِمۡ اٰیٰتِهٖ وَ یُزَکِّیۡهِمۡ وَ یُعَلِّمُهُمُ الۡکِتٰبَ وَ الۡحِکۡمَةَ.

তিনিই উম্মিদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যে তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে; তাদের পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।

(সূরা জুমুআহ – ২)

সুতরাং আমরা যদি চাই, যে উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল ও নবী প্রেরণ করা হয়েছে তা পুরা হোক, তাহলে আমাদের উচিত হবে কুরআন-সুন্নাহ্র ইলম হাসিল করা। যাতে হাশরের ময়দানে নবী আমাদের বিরূদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করে না বলেন,

یٰرَبِّ اِنَّ قَوۡمِی اتَّخَذُوۡا هٰذَا الۡقُرۡاٰنَ مَهۡجُوۡرًا.

হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে বিলকুল পরিত্যাগ করেছিল। (সূরা ফুরকান – ৩০)

সূরা কাহাফে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত খিজির আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘটনা উল্লেখ করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, একজন অনেক উঁচু মর্যাদার নবীও ইলম ও হিকমত শিক্ষার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং আরেকজনের পিছে পিছে ঘুরেছেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে হযরত মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম খিজির আলাইহি ওয়াসাল্লামনকে বললেন,

هَلۡ اَتَّبِعُكَ عَلٰۤی اَنۡ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمۡتَ رُشۡدًا.

আমি কি তোমার অনুসরণ করব এই মর্মে যে, তুমি আমাকে হেদায়েতের বাণী শেখাবে, যা তোমাকে শেখানো হয়েছে। (সূরা কাহাফ – ৬৬)

হযরত মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খিজির আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘটনা সবিস্তারে কুরআনে কারিমে সূরা কাহাফের শেষে উল্লেখ আছে। সেখানে একজন ইলম অন্বেষণকারীর জন্য বহু শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে।

কুরআনে কারীমের এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে দুআ শিখিয়েছেন,

رَبِّ زِدۡنِیۡ عِلۡمًا.

হে আমার প্রভু, আমার ইলম বৃদ্ধি করে দাও। (সূরা ত্ব-হা – ১১৪)

আল্লামা কুরতুবী রাহ. বলেন, ইলমের চেয়ে অন্য কোনো আমল যদি আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় হতো তবে তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেটা বৃদ্ধির জন্যই দুআ করতে নির্দেশ দিতেন। কুরআনে কারিমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলম ছাড়া অন্য কোনো জিনিস বৃদ্ধির জন্য দুআ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি।
এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-
وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ.
মুমিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে। যাতে তারা সতর্ক হয়। (সূরা তাওবা – ১২২)

প্রখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা কুরতুবী রাহ. বলেন, কুরআনের এই আয়াতটি ইলম অন্বেষণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একটি বড় দলীল। তিনি আরো বলেন, ইলম অন্বেষণ করা এমন মহা সম্মান ও মর্যাদার বিষয়, অন্য কোনো আমল যার সমকক্ষ হতে পারে না। (তাফসীরে কুরতুবী– ৮/২৬৬, ২৬৮)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন করলে স্পষ্টভাবেই বুঝে আসে, তিনি ইলমকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয এবং বিরাট সওয়াবের কাজ হিসেবেই অবলম্বন করেছিলেন এবং এভাবে অবলম্বনের জন্যই উম্মতকে জোর তাকিদ করেছেন। ইলমের প্রতি এত উৎসাহ দিয়েছেন এবং এত অধিক ফযীলত বর্ণনা করেছেন যে, বৃদ্ধদের মাঝেও ইলম তলবের অদম্য স্পৃহা জেগে উঠেছে। শুধু তাই নয়, ইলমের প্রতি অনীহা প্রকাশকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

ইলমের প্রতি কোনো এক সম্প্রদায়ের অনাগ্রহের কথা জানার পর তিনি ইরশাদ করেন,
مَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يُفَقِّهُونَ جِيرَانَهُمْ، وَلَا يُعَلِّمُونَهُمْ، وَلَا يَعِظُونَهُمْ، وَلَا يَأْمُرُونَهُمْ، وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ. وَمَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَلَا يَتَفَقَّهُونَ، وَلَا يَتَّعِظُونَ. وَاللهِ لَيُعَلِّمَنّ قَوْمٌ جِيرَانَهُمْ، وَيُفَقِّهُونَهُمْ وَيَعِظُونَهُمْ، وَيَأْمُرُونَهُمْ، وَيَنْهَوْنَهُمْ، وَلْيَتَعَلَّمَنّ قَوْمٌ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَيَتَفَقَّهُونَ، وَيَتَفَطَّنُونَ، أَوْ لَأُعَاجِلَنّهُمُ الْعُقُوبَة.

ওই সম্প্রদায়ের কী হল যে, তারা প্রতিবেশীদেরকে দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করে না; দ্বীন শিক্ষা দেয় না, দ্বীনের বিষয়াবলী বোঝায় না, তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করে না, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে না? ওই সম্প্রদায়েরই বা কী হল যে, তারা প্রতিবেশী থেকে দ্বীন শেখে না, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ নেয় না, দ্বীনের বিষয়াদি বুঝে নেয় না?

আল্লাহর কসম! হয়ত তারা তাদের প্রতিবেশীদেরকে দ্বীন শেখাবে, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করবে, দ্বীনের বিষয়াদি বোঝাবে, সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে আর যারা জানে না ওরা তাদের থেকে শিখবে, সঠিক বুঝ গ্রহণ করবে, দ্বীনের বিষয়াদি ভালোভাবে বুঝে নেবে নতুবা আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই নগদ শাস্তি দিব। (আলমুজামুল কাবীর, তবারানী; মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ – ১/১৬৪) [মাসিক আল কাউসার]

ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য:

ইসলামে ইলম বা জ্ঞান অর্জন এমন একটি ইবাদত, যা মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে, অন্ধকার দূর করে এবং হেদায়েতের আলো জ্বালিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করার পর তাকে যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, তার অন্যতম ভিত্তি হলো জ্ঞান। জ্ঞান মানুষকে পৃথিবীতে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে এবং পরকালে সফলতার পথ খুলে দেয়।

একজন মুসলিমের জীবনে ইলম অর্জন শুধুমাত্র দুনিয়াবী সফলতার জন্য নয়, বরং দুনিয়া ও আখিরাত দুই জগতেই কল্যাণ লাভের উপায়। ইলমের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহকে সঠিকভাবে চেনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন গড়ে তোলে, এবং সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

ইলম মানুষের অন্তরে এমন একটি শক্তি সৃষ্টি করে যা তাকে ন্যায়ের পথে দৃঢ় রাখে, ভুল কাজ থেকে দূরে রাখে এবং প্রতিটি কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি চিন্তা করতে শেখায়। তাই ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য অত্যন্ত বিস্তৃত, গভীর এবং মানুষের জীবনের প্রতিটি দিককে প্রভাবিতকারী।

ইলম অর্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা।

ইলম এমন একটি ইবাদত যেটি আল্লাহর দিকে যাওয়া প্রতিটি পথকে সহজ করে। যখন মানুষ আল্লাহর বিধানগুলো জানে, তখন সে সেগুলোর উপর আমল করতে পারে, যা তাকে আল্লাহর কাছে আরও ঘনিষ্ঠ করে তোলে।

ইলম অর্জনে নিয়ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি কেউ ইলম শুধু দুনিয়ার লাভ, সম্মান, বিতর্ক জেতা বা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অর্জন করে, তবে সেই ইলম বরকতহীন হয়ে যায়।
কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করে, তার জন্য আল্লাহ ইলমকে এমন এক আলো বানিয়ে দেন যা তাকে সঠিক পথে স্থির রাখে।

ইলম মানুষকে এমন পথ দেখায় যা জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়।
রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন
“যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।” (মাসিক আল কাউসার)

ইলম মানুষের চরিত্রে ধৈর্য, বিনয়, সততা, নীতি, ন্যায়পরায়ণতা, পরহেজগারি ইত্যাদি গুণ তৈরি করে।

এ কারণে বলা হয়, ইলম হলো আত্মার উন্নতি, চরিত্রের সৌন্দর্য সৃষ্টি ও আমলের পরিশুদ্ধি।
ইলম অর্জনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো দ্বীনের সঠিক জ্ঞান সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া।
অজ্ঞতা যখন সমাজে ছড়িয়ে পড়ে, তখন ভুল বিশ্বাস, কুসংস্কার, বিদআত ও অপব্যাখ্যা তৈরি হয়।

সেই অন্ধকার দূর করতে প্রয়োজন সঠিক ইলম।
যে ব্যক্তি দ্বীনের সঠিক জ্ঞান রাখে, সে মানুষকে সঠিক পথে দাওয়াত দিতে পারে এবং সমাজে ন্যায় ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।
ইলম এমন একটি আলো, যা শুধু ব্যক্তিজীবন নয়, পুরো সমাজকে বদলে দিতে পারে।

ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং পরকালীন সব দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইলম ও মানবজীবনের সম্পর্ক:

মানব জীবন শুধু দেহের ওপর টিকে থাকে না; বরং আত্মা, বিবেক, নৈতিকতা, হেদায়েত এবং আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক এসব মিলেই মানুষের প্রকৃত জীবন গঠিত হয়। আর এই সমস্ত কিছুর মূল উৎস হলো ইলম। বিশেষত ইলমে দ্বীন এমন একটি আলো, যা মানুষের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনকে আলোকিত করে, ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে চালিত করে।

ইলম ছাড়া মানুষ দিকহারা পথিকের মতো, যে জানে না কোনটি সত্য, কোনটি মিথ্যা; কোনটি কল্যাণকর, কোনটি ক্ষতিকর; কোন পথ আল্লাহর দিকে নিয়ে যায়, আর কোন পথ ধ্বংসের দিকে ধাবিত করে। ইলমই মানুষের সামনে সেই পথকে স্পষ্ট করে দেয়। তাই ইলম ও মানব জীবনের সম্পর্ক গভীর, দৃঢ় এবং জীবনব্যাপী।

ইলমের আলো মানুষকে শুধু আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত করে না; বরং তার চরিত্র, আচরণ, সিদ্ধান্ত, পরিবার-সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক, এমনকি পেশাগত জীবনেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।
ইলম মানুষকে তার স্রষ্টার সঠিক পরিচয় করিয়ে দেয়।

আল্লাহ তাআলার গুণাবলী, কুদরত, রহমত, শাস্তি, দিব্য হুকুম সবকিছুই ইলমের মাধ্যমে জানা যায়।

যখন মানুষ জানে আল্লাহ কী চান এবং কোন কাজ তাঁর সন্তুষ্টির কারণ, তখন সে তার জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারে।
ইলমের অভাবে মানুষ ভুল ধারণা, কুসংস্কার ও শয়তানের প্রতারণার শিকার হয়।
ইলমই মানুষকে আল্লাহর দিকে নিয়ে যাওয়ার পথ সুস্পষ্ট করে দেয়।

পৃথিবীতে অসংখ্য মতবাদ, ধারণা, চিন্তাধারা ও বিশ্বাস বিদ্যমান।
মানুষ যদি নিজ জ্ঞানের ওপর ভরসা করে, তাহলে সহজেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে পারে। কিন্তু ইলম মানুষকে সত্যের পথ নির্দেশ করে।
কুরআন ও হাদিসের ইলম এমনভাবে সঠিক পথকে স্পষ্ট করে দেয় যে, মানুষ আর গোমরাহীর অন্ধকারে পড়ে না।

একজন মুসলিমের সঠিক বিশ্বাস, সঠিক আমল এবং সঠিক চিন্তা ইলম ছাড়া কখনোই পূর্ণতা পায় না।

দ্বীনের ইলম মানুষের অন্তরে কোমলতা, ভাবগম্ভীরতা এবং গভীরতা সৃষ্টি করে।
যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম, নবীর বাণী এবং ইসলামের মূলনীতিগুলো জানে ও তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে, তার অন্তর স্বচ্ছ হয়ে যায়।
মানুষ স্বভাবতই ভুল করে।

তাই ইলম ছাড়া সে কোন কাজ হেদায়েতের, আর কোন কাজ গোমরাহীর তা বুঝতে পারে না।
ইলম মানুষের মাঝে একটি শক্তিশালী "চিন্তা-ফিল্টার" তৈরি করে, যার মাধ্যমে সে সবকিছুকে যাচাই-বাছাই করতে পারে।
ইলম শুধু তথ্য দেয় না; এটি মানুষের অন্তরকে বদলে দেয়। ইলম মানুষকে পশুসুলভ প্রবৃত্তি থেকে দূরে সরিয়ে ফেরেশতাসুলভ গুণের দিকে নিয়ে যায়। একজন শিক্ষিত মুমিনের চরিত্র তার আসল মনুষ্যত্বকে প্রকাশ করে এটি ইলমেরই ফল।

ইলম মানুষকে শুধু নিজের জীবনেই উপকার দেয় না; বরং পুরো দ্বীনকে রক্ষা করতে সহায়ক হয়। এই সবকিছুর মোকাবেলা করতে ইলম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

ইলম সম্পন্ন ব্যক্তি সত্যকে প্রমাণ করতে পারে, ভ্রান্তির জবাব দিতে পারে এবং দ্বীনকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারে।

নবীরা মানুষের কাছে দুনিয়ার কোনো সম্পদ রেখে যাননি; তারা রেখে গেছেন ইলম।

তাই যারা ইলম শিখে, তা প্রচার করে এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে, তারা নবীদের কাজকে বহন করার সম্মান পান।
এই মর্যাদা পৃথিবীর আর কোনো সম্পদ দিয়ে পাওয়া যায় না।

ইলম মানব জীবনের প্রতিটি অংশের প্রভাব ফেলে ইলম ছাড়া জীবন একটি অন্ধকার পথ, আর ইলম সেই পথের একমাত্র আলো। (মাসিক আল কাউসার)

ইলমের মাহাত্ম্য:

আল্লাহ তাআলার সর্বোত্তম আনুগত্য প্রকাশ করা এবং তাঁর নৈকট্য অর্জনের অন্যতম প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো ইলম অর্জনে নিজেকে নিয়োজিত করা। ইলম একটি মহান ইবাদত, যা শুধু আনুষ্ঠানিক ইবাদতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি মানুষের সমগ্র জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার একটি পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে ইলমের সম্পর্ক গভীরভাবে জড়িত। ইলম এমন একটি আমল, যা আল্লাহ তাআলার নিকট অত্যন্ত প্রিয়। সালাফে সালেহীন নিষ্কলুষ হৃদয়ের অধিকারী পূর্বসূরি নেককার ব্যক্তিগণ সর্বদা ইলম অর্জনে নিজেদের ব্যস্ত রাখতেন। তারা রাত দিন ইলমের আলোয় নিজেদের জীবনকে আলোকিত করতেন। একইভাবে কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী পুণ্যবান ব্যক্তিগণও সর্বদা ইলম অর্জনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

ইলমের মর্যাদা এতই উচ্চ যে, এর ফজিলত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বহু আয়াতে কারিমা অবতীর্ণ হয়েছে এবং অসংখ্য সহিহ হাদিসে এর মহিমা বর্ণিত হয়েছে। এমনকি সালাফে সালেহীনের জ্ঞানগর্ভ ও প্রদীপতুল্য বাণীসমূহ ইলমের মর্যাদাকে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।
এক কথায় বলা যায়, ইলম হলো সকল কল্যাণের চাবিকাঠি। এটি এমন একটি মাধ্যম, যার দ্বারা আল্লাহর আদেশ নিষেধ সঠিকভাবে জানা যায় এবং তা যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব হয়। তাই ইলম ব্যতীত ঈমান ও আমলের পরিপূর্ণতা কল্পনাও করা যায় না। কারণ ইলমই মানুষকে আল্লাহর ইবাদত সঠিকভাবে করার সক্ষমতা দান করে

এবং শরিয়তের হুকুম-আহকাম যথাযথভাবে বুঝতে সহায়তা করে। দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও দাওয়াতের কাজের জন্যও ইলম অপরিহার্য ভিত্তি।

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যেমন খাদ্য ও পানীয় অপরিহার্য, তেমনি তার আত্মিক জীবন, ঈমান ও আমলের জন্য ইলম অর্জন তার চেয়েও বহুগুণ বেশি প্রয়োজনীয়। কারণ ইলমের উপরই দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ নির্ভরশীল। এটি পার্থিব ও পরকালীন জীবনের তত্ত্বাবধায়ক এবং উভয় জগতে মানুষের জীবনের দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেন,
"মানুষ যতটা না খাদ্য ও পানীয়ের মুখাপেক্ষী, তার চেয়েও অধিক মুখাপেক্ষী হলো জ্ঞান অর্জনের প্রতি। কারণ সে দিনে কয়েকবার পানাহারের প্রয়োজন অনুভব করে, কিন্তু ইলমের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় প্রতিটি মুহূর্তে।"
তিনি আরও বলেন, যদি মানুষকে ইলমের এ নিয়ামত দান করা না হতো, তবে মানুষের সঙ্গে চতুষ্পদ জন্তুর কোনো পার্থক্য থাকত না। সুতরাং বোঝা যায়, মানুষের প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্বের মূল ভিত্তি হলো ইলম।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে জ্ঞান ও বুদ্ধি দান করেছেন, যার মাধ্যমে সে তাঁর প্রেরিত দ্বীনকে সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে এবং তাঁর আদেশ নিষেধের প্রতি অনুগত থাকতে পারে।
আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বিশেষভাবে ইলম বৃদ্ধির জন্য দোয়া করতে নির্দেশ দিয়েছেন

وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

অর্থ: "আর বলুন, হে আমার প্রতিপালক, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।"(সূরা ত্বাহা ১১৪)
এই আয়াত প্রমাণ করে যে, ইলম অর্জন একটি অবিরাম প্রক্রিয়া এবং এটি আল্লাহর নিকট অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি বিষয়।

ইলমকে একটি মর্যাদামণ্ডিত বৃক্ষের সাথে তুলনা করা যায় এটি সকল গাছের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ, যা সবুজ-শ্যামল, ছায়াময় এবং ফলবান। ইলমের অন্বেষণ ইবাদত, এর আলোচনা পুণ্যময় এবং এর প্রতি মনোনিবেশ আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যম।

আহলে ইলম বা জ্ঞানীদের মর্যাদা কুরআন ও হাদিসে অত্যন্ত উচ্চভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, তারা আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন, যা ইসলামের মূল ভিত্তি।

আহলে ইলমরাই আল্লাহকে সর্বাধিক ভয় করে, কারণ তারা আল্লাহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখে। তারা আখিরাতের সাক্ষাতের প্রতি আশাবাদী এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, আলিমদের জন্য আসমান জমিনের সকল সৃষ্টি এমনকি ফেরেশতা, সমুদ্রের মাছ এবং পিপীলিকা পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে। এটি ইলমের মর্যাদার এক অনন্য প্রমাণ।
ইলমের মাহাত্ম্য ইসলামে অত্যন্ত উচ্চ এবং অনন্য। কুরআন ও হাদিসে এর গুরুত্ব অসংখ্যভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইলম ছাড়া ঈমান, আমল এবং দ্বীন পরিপূর্ণভাবে পালন করা সম্ভব নয়। (ব্যস্ততার এ যুগে ইলম অন্বেষণ)

২)কোরআন ও হাদিসভিত্তিক টপিক

কোরআনের আলোকে ইলমের মর্যাদা:

কোরআনের আলোকে ইলমের মর্যাদা :

ইসলামে ইলম (জ্ঞান) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কোরআন বারবার মানুষকে জ্ঞান অর্জনের জন্য উৎসাহিত করেছে এবং জ্ঞানীদের উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ইলমের মর্যাদা, প্রয়োজনীয়তা এবং এর ফলাফল বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কুরআনের আলোকে ইলমের মর্যাদা সম্পর্কে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১. জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ:

কুরআনে আল্লাহ তাআলা রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দোয়া করতে।

"وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا"

"হে আমার প্রতিপালক, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।"(সুরা তহা-১১৪)

এটি একমাত্র দোয়া যেখানে সরাসরি জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায়, ইলমের মর্যাদা কত উচ্চ।

২. জ্ঞানী ও অজ্ঞ সমান নয়:

আল্লাহ বলেন,

"قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُون"

"বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না— তারা কি সমান?"(সুরা জুমার-৯)

এই আয়াত প্রমাণ করে, ইসলামে জ্ঞানীদের মর্যাদা অজ্ঞদের চেয়ে অনেক বেশি।

৩. আল্লাহ জ্ঞানীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন:

কুরআনে বলা হয়েছে,

"يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ"

“আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত— তাদের মর্যাদা বহু স্তরে উন্নীত করবেন।”(সুরা মুজাদালা–১১)
এখানে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে ইলম মানুষকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করে।

৪. আল্লাহকে ভয় করে জ্ঞানীরা:
আল্লাহ বলেন,

“إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء”ُ

“নিশ্চয়ই আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই ভয় করে।”(সুরা ফাতির–২৮)
এ আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যায় প্রকৃত জ্ঞান মানুষকে আল্লাহভীরু বানায় এটিই ইলমের আসল উদ্দেশ্য।

৫. প্রথম ওহীর মাধ্যমে জ্ঞানের গুরুত্ব:
ইসলামের প্রথম ওহীই ছিল পড়ার নির্দেশ।

“اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ”َ

“পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।
(সুরা আলাক–১)
ইসলামের সূচনা হয়েছে জ্ঞান ও শিক্ষার মাধ্যমে যা ইলমের গুরুত্বকে আরও স্পষ্ট করে।

কুরআনের আলোকে ইলম মানবজীবনের উন্নয়ন, নৈতিক শুদ্ধি এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের অন্যতম প্রধান উপাদান। ইলম মানুষের মাঝে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা সৃষ্টি করে এবং তাকে আল্লাহর প্রতি দায়িত্বশীল ও সচেতন করে তোলে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইলম একটি নৈতিক শক্তি, যা ব্যক্তি ও সমাজকে অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং অন্যায় থেকে মুক্ত করতে সহায়তা করে। কুরআনিক শিক্ষার আলোকে, যে জ্ঞান মানুষকে আল্লাহর নৈকট্যে নিয়ে যায় না, তা পূর্ণাঙ্গ ইলম হিসেবে গণ্য হয় না। এটি ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক— তিনটি স্তরেই প্রভাব বিস্তার করে। অতএব, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ইলম অর্জন একটি অপরিহার্য দায়িত্ব।

হাদিসে ইলম অর্জনের ফজিলত:

ইলম (জ্ঞান) এমন একটি মৌলিক উপাদান যা মানবজীবনের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক বিকাশের ভিত্তি স্থাপন করে। কোরআন এর পাশাপাশি হাদিসসমূহে ইলমের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং ফজিলত অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণীসমূহে জ্ঞান অর্জনকে কেবল একটি ঐচ্ছিক কাজ হিসেবে নয়, বরং একটি অপরিহার্য দায়িত্ব ও ইবাদত হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। হাদিসের আলোকে ইলম অর্জনের ফজিলত সম্পর্কে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১)রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের সহীহ সমঝ দান করেন। (সহীহ বুখারী – ৭১, সহীহ মুসলিম – ১০৩৭)

২)আরো ইরশাদ করেছেন-

لاَ حَسَدَ إِلّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারেই হিংসা হতে পারে না। এক. আল্লাহ পাক যাকে সম্পদ দান করেছেন আর সে ন্যায়ের পথে খরচ করতে থাকে। দুই. যাকে দ্বীনী জ্ঞান দান করেছেন আর সে তা দিয়ে বিচার করে এবং তা মানুষকে শেখায়। (সহীহ বুখারী – ৭৩, সহীহ মুসলিম – ৮১৬)

৩)অন্য হাদীসে ইরশাদ করেছেন-

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنّةِ.

যেই ব্যক্তি ইলম তলবের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করবে আল্লাহ পাক এর বদৌলতে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন। (সহীহ মুসলিম – ২৬৯৯)

হযরত সাফওয়ান ইবনে আস্সাল রা. বলেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তখন তিনি মসজিদে বসে ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এসেছি ইলম শিক্ষা করার জন্য। তিনি বললেন, তালেবে ইলমকে মারহাবা। নিশ্চয় তালেবে ইলমকে ফিরিশতাগণ বেষ্টন করে রাখে এবং তাঁদের ডানা দিয়ে তাকে ছাঁয়া দিতে থাকে। অতঃপর তাঁরা সারিবদ্ধভাবে প্রথম আসমান পর্যন্ত মিলে

মিলে দাঁড়িয়ে যায়। এসব কিছু তাঁরা সে যা অন্বেষণ করছে তার ভালবাসায় করে। (আখলাকুল উলামা, আর্জুরী – ১/৩৭, তবারানী কাবীর – ৭৩৪৭, মাজমাউয যাওয়ায়েদ –৫৫০)

৪)হাদীস শরীফে ইলম অন্বেষণের রাস্তাকেও আল্লাহর রাস্তা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ.

যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য বের হল সে আল্লাহর রাস্তায় বের হল। (জামে তিরিমিযী –২৬৪৭)

৫)অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে-

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

যেই ব্যক্তি আমার মসজিদে আসল শুধু একারণে যে, সে কোনো কল্যাণের বাণী শিখবে অথবা শেখাবে সেই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়। (সুনানে ইবনে মাজাহ – ২২৭, মুসনাদে আহমাদ – ৯৪১৯)

৬)অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

যখন মানুষ মারা যায় তার সকল আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তিনটি রাস্তা খোলা থাকে। এক. ছদকায়ে জারিয়া। দুই. এমন ইলম, যা থেকে (মানুষ) উপকৃত হয়। তিন. নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে। (সহীহ মুসলিম –১৬৩১)

আরো ইরশাদ হয়েছে, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন মাজীদ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। (সহীহ বুখারী – ৫০২৭)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু জর রাদিআল্লাহু আনহুকে সম্বোধন করে বলেছেন, হে আবু জর, কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করা তোমার জন্য একশ রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা তোমার

জন্য এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। চাই এর উপর আমল করা হোক বা না হোক। (সুনানে ইবনে মাজাহ -২১৯) (মাসিক আল কাউসার)

হাদিসের আলোকে ইলম অর্জন একটি সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ইবাদত, যা মানুষের দুনিয়াবী ও আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত করে। এটি ব্যক্তিকে নৈতিকভাবে উন্নত করে, সমাজকে আলোকিত করে এবং মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধিতে সহায়তা করে।

প্রথম ওহীতে ইলমের গুরুত্ব :

ইসলামী সভ্যতা ও জ্ঞানতত্ত্বের সূচনা একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার মাধ্যমে প্রথম ওহীর অবতরণ। কোরআন এর প্রথম নাযিলকৃত আয়াতসমূহ মানবজাতিকে জ্ঞান, শিক্ষা ও চিন্তার পথে আহ্বান করে। এটি মানব সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের সূচনা নির্দেশ করে।

এই আলোচনায় প্রথম ওহীর আয়াতসমূহের মাধ্যমে ইলমের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হবে।

প্রথম ওহীর আয়াত ও জ্ঞানের সূচনা

প্রথম ওহী:

"اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ"

(সুরা আলাক ১-৫)

এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে ইসলামের প্রথম নির্দেশই ছিল "পড়ো"—যা ইলম অর্জনের সরাসরি আহ্বান।

"اقْرَأْ" (পড়ো) শব্দটি ইসলামী জ্ঞানতত্ত্বের মূল ভিত্তি। এটি কেবল বই পড়ার নির্দেশ নয়; বরং—

জ্ঞান অনুসন্ধান

চিন্তা ও গবেষণা

পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ

এটি একটি পূর্ণাঙ্গ বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রমের সূচনা নির্দেশ করে।

প্রথম ওহীতে বলা হয়েছে:

“بِاسْمِ رَبِّكَ” (তোমার প্রতিপালকের নামে)

এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে,

জ্ঞান হবে আল্লাহকেন্দ্রিক

জ্ঞান হবে নৈতিক ও দায়িত্বশীল

জ্ঞান হবে সৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত

অতএব, ইসলামে ইলম কেবল তথ্য নয়; এটি একটি নৈতিক দায়িত্ব।

“কলম” এর মাধ্যমে জ্ঞানের গুরুত্ব

আয়াতে বলা হয়েছে,

“الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ”

“যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন”

এটি নির্দেশ করে,

লেখার গুরুত্ব

জ্ঞান সংরক্ষণ ও প্রচার

শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ

ইসলামে শিক্ষা শুধু মৌখিক নয়, বরং লিখিত জ্ঞানচর্চাকেও অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মানব জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও আল্লাহর জ্ঞান

আয়াতে বলা হয়েছে,

“عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ”

“তিনি (আল্লাহ) মানুষকে সেই জিনিস শিক্ষা দিয়েছেন যা সে আগে জানত না।”(সুরা আলাক – ৫)

এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে,

মানুষ জন্মগতভাবে অজ্ঞ

আল্লাহই জ্ঞানের উৎস

জ্ঞান অর্জন একটি চলমান প্রক্রিয়া

এটি মানুষকে বিনয়ী হতে শেখায়।

প্রথম ওহীর মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞানতত্ত্বের তিনটি মূলনীতি নির্ধারিত হয়,

জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য
জ্ঞান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত
জ্ঞান মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হওয়া উচিত।
প্রথম ওহীর শিক্ষা কুরআনের অন্যান্য আয়াতে পুনরায় নিশ্চিত করা হয়েছে
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ালাইকুম সালাম বলেন:
"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।"
(সুনান ইবনে মাজাহ হাদিস – ২২৪)
তিনি আরও বলেন:
"যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।"
(সহিহ মুসলিম হাদিস – ২৬৯৯)
ওহীর মাধ্যমে কোরআনের বিভিন্ন স্থানেই ইলমের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে।

নবীদের জীবনে জ্ঞানের ভূমিকা:

ইসলামে নবুওয়ত ও জ্ঞান একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। আল্লাহ তাআলা যেসব নবীকে পাঠিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেককেই বিশেষ জ্ঞানের মাধ্যমে মানবজাতির পথপ্রদর্শক করেছেন। নবীদের জীবন অধ্যয়ন করলে স্পষ্ট বোঝা যায় জ্ঞানই তাঁদের দাওয়াত, নেতৃত্ব, সমাজ সংস্কার এবং হিদায়াতের মূল ভিত্তি।

মানবজাতির প্রথম নবী আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে জ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সমস্ত বস্তুর নাম শিখিয়ে দিয়ে মানুষের জ্ঞান শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। আল্লাহ বলেন,

"وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا"

অর্থ: "আর আল্লাহ আদমকে সব নাম শিক্ষা দিলেন।" (সুরা আল-বাকারাহ – ৩১)
এ শিক্ষা শুধু কয়েকটি নামের তালিকা নয় বরং মানববোধ, চিন্তা, ভাষা এবং জ্ঞানচর্চার সূচনা। এখান থেকেই মানুষের মাঝে জ্ঞানভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের বুনিয়াদ স্থাপিত হয়।

আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর বহু যুগ পরে নবী ইবরাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুক্তিবাদ, পর্যবেক্ষণ ও চিন্তাশীলতার মাধ্যমে জ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে মহাবিশ্বের বিশাল ক্ষমতা ও নিদর্শনগুলো দেখিয়ে সত্য অনুসন্ধানের পথ শেখান। কুরআনে বলা হয়েছে,

"وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ"

অর্থ: "এভাবেই আমরা ইবরাহিমকে আসমান ও জমিনের রাজত্ব দেখিয়েছিলাম।"(সুরা আল-আন'আম – ৭৫)

তারকা, চাঁদ ও সূর্যের বিশ্লেষণ করে তিনি প্রমাণ করেন কোনো সৃষ্টিই উপাস্য হতে পারে না; উপাস্য একমাত্র আল্লাহই। এখানে জ্ঞানের পরিচয় যুক্তি, পর্যবেক্ষণ ও গভীর চিন্তা।

পরবর্তীতে নবী মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনে জ্ঞান আরও একটি রূপ নেয় শরিয়ত ও আইন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে তাওরাত দান করেন, যাতে জীবনের প্রতিটি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা ছিল। আল্লাহ বলেন,

"وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً"

অর্থ: "আর আমরা তাঁর জন্য ফলকে সব বিষয়ে উপদেশ ও নির্দেশনা লিখে দিয়েছি।"(সুরা আল-আরাফ – ১৪৫)

এ জ্ঞান সমাজ পরিচালনা, ন্যায়বিচার, নৈতিকতা এবং আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন গঠনের ভিত্তি স্থাপন করে।

ইতিহাসের আরেক চমৎকার জ্ঞানপ্রতিভা নবী ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম । তিনি প্রশাসন, অর্থনীতি ও ভবিষ্যত পরিকল্পনার জ্ঞান দিয়ে মিসরের বিশাল দুর্ভিক্ষ থেকে মানুষকে রক্ষা করেন।

তাঁর দূরদৃষ্টি, হিসাব-নিকাশের জ্ঞান ও প্রশাসনিক দক্ষতা প্রমাণ করে যে জ্ঞান বাস্তব জীবনে কীভাবে মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হতে পারে।

নবী দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহ তায়ালা প্রজ্ঞা, ন্যায়বিচার ও রাজ্য পরিচালনার জ্ঞান দান করেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে,

"وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ"

অর্থ: "আর আমরা তাঁকে প্রজ্ঞা দান করেছি।"(সুরা সাদ – ২০)
তিনি ন্যায়নিষ্ঠ বিচার, রাষ্ট্র পরিচালনা এবং সমাজে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় অসাধারণ উদাহরণ ছিলেন।

তারপর তাঁর পুত্র নবী সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি জ্ঞানের বহুমাত্রিক দৃষ্টান্ত। তিনি শুধু নেতৃত্ব বা রাজনীতি নয়, প্রাণীজগত, প্রকৃতি, প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনাবসব ক্ষেত্রেই উন্নত জ্ঞান লাভ করেছিলেন। কুরআনে বলা হয়েছে,

"عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ"

অর্থ: "আমাদেরকে পাখিদের ভাষা শেখানো হয়েছে।" (সুরা আন-নামল – ১৬)
এখানে জ্ঞানের রূপ দেখা যায়,বিজ্ঞান, যোগাযোগ, রাষ্ট্রশক্তি এবং বাস্তব জগতের গভীর উপলব্ধি।

শেষে আসে নবুওয়তের পরিপূর্ণতা নবী মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে। তাঁর প্রথম ওহীই ছিল জ্ঞানের আহ্বান,

"اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ"

অর্থ: "পড়ো তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।"(সুরা আল-আলাক – ১)
এই আয়াত মানবজীবনে শিক্ষার গুরুত্ব, চিন্তা ও জ্ঞানের দরজা খুলে দেয়। নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা, নৈতিকতা, সমাজ পরিবর্তন, রাষ্ট্র পরিচালনা সব ক্ষেত্রে জ্ঞানকে ব্যবহার করে একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেন।

নবীদের জ্ঞান ছিল তিনটি মূল স্তম্ভে গঠিত
১.ওহীর আলো,
২.নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বচ্ছতা,
৩.বাস্তব জীবনের ব্যবহারিক প্রজ্ঞা।
এই তিনটি মিলেই তাঁদের নেতৃত্ব কার্যকর, কল্যাণকর ও আদর্শিক হয়ে ওঠে।

নবীদের জীবনে জ্ঞান কেবল একটি উপাদান ছিল না; বরং তাঁদের দাওয়াত, আধ্যাত্মিকতা, বিচার, নেতৃত্ব, সমাজ সংস্কার সবকিছুর মূল চালিকাশক্তি।

সাহাবীদের ইলম অর্জনের উদাহরণ:

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর জীবন বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই তাঁরা একদিকে জীবিকা অন্বেষণে ব্যস্ত থাকতেন, আবার অন্যদিকে ইলম অর্জন ও দীন শেখাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতেন। তাদের জীবনের কর্মপন্থা ছিল এমন নিখুঁত ও সুসংগঠিত যে, দুনিয়ার কাজ ও আখিরাতের ইলম দুটিকেই সুন্দরভাবে সামঞ্জস্য রেখে এগিয়ে যেতেন।

তাদের জীবনে ইলম ছিল ঐচ্ছিক কাজ নয়, বরং মূল দায়িত্ব। তারা অনুভব করতেন যে, ইলম অর্জন করা ছাড়া দীন বোঝা সম্ভব নয়, আর দীন না বুঝলে জীবন সঠিক পথে চলতে পারে না। তাই ব্যস্ততা, ব্যবসা, পরিবার কোন কিছুই তাদের ইলম থেকে দূরে রাখতে পারেনি।

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, "আমি ও আমার এক আনসারী প্রতিবেশী পালাক্রমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে যেতাম। একদিন সে যেত, আরেকদিন আমি যেতাম। যেদিন আমি যেতাম সেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট যে ওহী নাযিল হতো ও যে বিষয়সমূহ শিখানো হতো আমি ফিরে এসে তাকে সব জানিয়ে দিতাম। আর যেদিন সে যেত, সেও ফিরে এসে আমায় সব জানাত।"

এই বর্ণনাটি শুধু একটি ঘটনা নয়, এটি প্রমাণ করে যে সাহাবীগণ ইলম হারানোর ভয় পেতেন, তাই সুযোগ পেলে নিজেরাও শুনতেন এবং মিস হলে অন্যের মাধ্যমে শিখে নিতেন। একটি শব্দও যেন বাদ না যায় সে বিষয়ে তারা অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ এর ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করে বলেন,

"একজন প্রকৃত ইলমপিপাসু তার জীবিকার দায়িত্ব থেকে যেমন গাফিল হয় না, তেমনি ইলম অর্জনের দায়িত্ব থেকেও কখনো গাফিল হয় না। কোন দিন জীবিকার কারণে ইলমের মজলিসে যেতে না পারলে পরে সে ছুটে যাওয়া ইলমও অর্জন করে নেয়।"

অর্থাৎ ইলম তাদের কাছে মূল কাজ, আর রুজি রোজগার তার অংশমাত্র। কিন্তু আজ আমরা ঠিক উল্টো করেছি দুনিয়ার কাজগুলোকে মূল কাজ বানিয়ে ইলমকে অতিরিক্ত হিসেবে রাখছি।

ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ আরও উল্লেখ করেন

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যবসা বাণিজ্য করতেন, জীবিকা অর্জন করতেন, এবং আল্লাহর রাস্তায় দানও করতেন। কিন্তু এত ব্যস্ততার মাঝেও ইলম থেকে দূরে সরে যাননি। বরং প্রতিদিন শিখেছেন, জেনেছেন, এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটের ইলম গ্রহণ করেছেন।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন ধনী সাহাবী। অথচ তার ধন সম্পদ কখনো তাকে ইলম থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি। তিনি জিহাদের প্রস্তুতির জন্য অসংখ্য উট, ঘোড়া ও সম্পদ দান করেছেন; আবার দীন শিখতে, শিখাতে ও কোরআনের বোঝাপড়া গ্রহণে ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক।

আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবনও একই রকম। বাণিজ্যে সফল হওয়া সত্ত্বেও তিনি ইলম থেকে কখনো বিরত হননি। যখনই জীবিকার প্রয়োজন হতো তিনি বাজারে যেতেন, লেনদেন করতেন, উপার্জন করতেন কিন্তু ইলমের মজলিস ও দাওয়াতের আসর কোনোভাবেই বাদ দিতেন না।

অনেকে ছিলেন যাদের কোনো মূলধন ছিল না তবুও ইলম থেকে তাদেরকে পৃথক করতে পারেনি দারিদ্র্য বা কঠিন অবস্থা। দ্বীন শেখা এবং মানুষকে শেখানো ছিল তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য।

সাহাবীগণ ইলম অর্জনে এতটাই আগ্রহী ছিলেন যে, তারা শুধু কোরআনের আয়াত বা হাদিসের শিক্ষা নয় বরং জীবনব্যবহারিক সব বিষয়ও নবী থেকে শিখতে চাইতেন। এমনকি দাস-দাসীর সাথে কীভাবে কথা বলতে হবে, কাউকে কীভাবে সম্বোধন করতে হবে এই আচরণগত শিক্ষাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থেকে জানতে চাইতেন।

ইবনে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ১০০টি দাস ছিল। তাদের প্রতেকের ভাষা ভিন্ন ছিল। তিনি প্রত্যেকের সাথে তাদের নিজ নিজ ভাষায় কথা বলতেন। অর্থাৎ তিনি সব দাসদের ভাষাই শিখেছিলেন!

এদিকে জায়েদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু মাত্র ১৫ দিন করে সময় নিয়ে তিনটি ভাষা শিখেছিলেন ইলমের প্রতি তাদের এই অসাধারণ আগ্রহ আজ আমাদের জন্য এক মহামূল্যবান শিক্ষা।

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম নিজেদের সর্বদা ইলম অর্জন, দ্বীন বোঝা এবং আমল করার জন্য প্রস্তুত রাখতেন। আজ আমরা তাদের উত্তরসূরী দাবি করি কিন্তু তাদের সেই আগ্রহ, সেই শ্রম, সেই মেহনতের সামান্য অংশও আমরা নিজেদের মধ্যে ধারণ করি না।
ব্যস্ততার এই যুগে আমরা ইলমকে পাশে সরিয়ে রেখে দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছি; অথচ সাহাবীগণ ব্যস্ততার মাঝেও ইলমকে জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছিলেন। ইলমই ছিল তাদের শ্রেষ্ঠত্বের রহস্য আর এটাই আমাদের জন্য অনুসরণীয় পথ।

৩) ইলমের শ্রেণীবিভাগ ও আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা

ফরজে আইন ও ফরজে কিফায়া ইলম:

ইলম দুই প্রকার।

১.ফরজে আইন ইলম

২. ফরজে কিফায়া ইলম

উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ; তবে প্রত্যেকটির শর্ত, উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব আলাদা।

ফরজে আইন ইলম হলো সেই জ্ঞান, যা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর আলাদাভাবে অর্জন করা ফরজ। অর্থাৎ এটি এমন ফরজ, যা সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর সরাসরি দায়িত্ব হিসেবে বর্তায়। ফরজে আইন ইলমের উদ্দেশ্য ব্যক্তি নিজেই।

ফরজে আইন ইলম হচ্ছে এমন ফরজ, যা সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর অর্জন ফরজ হয়। যাদের ওপর সেই ইলম অর্জন ফরজ হয়, তাদের প্রত্যেককেই তা আদায় করতে হয়। কিছু সংখ্যক ব্যক্তির সেই ইলম অর্জন আদায় করার দ্বারা বাকিরা দায়িত্বমুক্ত হয় না। যেমন নামায, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদি। এগুলো আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন, বান্দার অন্তরাত্মার উন্নয়ন ও পরিশুদ্ধি এবং জান মালের শুকরিয়া আদায়সহ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বান্দার ওপর এই ইলম অর্জনকে ফরজ করা হয়েছে। যাদের ওপর ফরজ করা হয়েছে, তাদের প্রত্যেককেই তা আদায় করতে হবে। কিছু সংখ্যক মুসলিমের নামায পড়া ও রোযা রাখার দ্বারা বাকিরা দায়িত্বমুক্ত হবে না। তেমনিভাবে কিছু সংখ্যক সামর্থ্যবান মুসলিমের যাকাত দেয়া বা হজ করার দ্বারা বাকি সামর্থ্যবানরা মুক্তি পাবে না। সকলকেই নামায পড়তে হবে এবং রোযা রাখতে হবে। সামর্থ্যবান সকলকেই যাকাত দিতে হবে এবং হজ করতে হবে।

পক্ষান্তরে ফরজে কিফায়া হচ্ছে এমন ফরজ, যা প্রথমত ফরজে আইনের মতো সকলের ওপরই ফরজ হয়, তবে কিছু সংখ্যক লোকের আদায় করার দ্বারা ফরজটি যথাযথ আদায় হয়ে গেলে সকলেই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়। আর আদায় না হলে সকলে গুনাহগার হয়। যেমন, মুসলিম মাইয়েতের জানাযা ও কাফন-দাফন সম্পন্ন করা একটি ফরজে কিফায়া। কিছু সংখ্যক মুসলিম মিলে তা করে নিলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়। বাকিরা শরিক না হলেও তারা গুনাহগার হবে না।

কিন্তু কেউই যদি আদায় না করে, তাহলে সকলেই গুনাহগার হবে।

ফরজে আইনের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি থেকে কাজটি সম্পাদিত হওয়া জরুরি। পক্ষান্তরে ফরজে কিফায়ার মধ্যে কাজটি অর্জিত হওয়া উদ্দেশ্য, যার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কাজটি করতে হয় না; ব্যক্তি-সমষ্টি থেকে কাজটি সম্পাদিত হওয়াই যথেষ্ট। (রদ্দুল মুহতার – ১/৪২, ৫৩৮; ৪/১২৩)

ফরজে কিফায়া সম্পর্কে দুটি ভুল ধারণা

এক.

অনেকে মনে করেন, ফরজে কিফায়ার অর্থ হচ্ছে, উম্মাহর কিছু লোকের ওপর ফরজ, বাকিদের ওপর ফরজ নয়। এ ধারণা সঠিক নয়। বরং ফরজে কিফায়াও ফরজে আইনের মতো সকলের ওপরই ফরজ। তবে কিছু লোকের মাধ্যমে কাজটি পূর্ণ হয়ে গেলে বাকিরা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু কাজটি যদি পরিপূর্ণ আদায় না হয়, তাহলে সকলেই ফরজ ত্যাগের দায়ে গুনাহগার হয়। শুধু তাই নয়; বরং একটি ফরজে কিফায়া ত্যাগ করার ভয়াবহতা ফরজে আইন ত্যাগ করার চেয়েও গুরুতর। একারণে যেখানে ফরজে কিফায়া ও ফরজে আইন এমনভাবে সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়ায় যে, একটি করলে অপরটি করা যায় না, সেখানে শরীয়ত ফরজে কিফায়াকে অগ্রাধিকার দেয়। বিশেষত দিফায়ী জিহাদের ক্ষেত্রে। এজন্যই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকের যুদ্ধে কয়েক ওয়াক্ত নামায কাযা করে জিহাদের কাজ চালিয়ে গেছেন এবং সেই নামাযগুলো পরে কাযা করেছেন। ফরজে কিফায়া যে সকল মুসলিমের ওপরই ফরজ এবং তা আদায় না হলে যে সকলেই গুনাহগার হয়, তা ফুকাহায়ে কেরামের অনেকেই সুস্পষ্ট করে বলেছেন।

ইবনে কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন,

معنى فرض الكفاية، الذي إن لم يقم به من يكفي، أثم الناس كلهم، وإن قام به من يكفي، سقط عن سائر الناس. فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع، كفرض الأعيان، ثم يختلفان في أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له، وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل غيره. اهـ

“ফরজে কিফায়ার অর্থ হচ্ছে, প্রয়োজন পরিমাণ লোকে তা আদায় না করলে সকলে গুনাহগার হবে, আর প্রয়োজন পরিমাণ লোকে আদায় করলে বাকিরা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। অতএব, শুরুতে ফরজে কিফায়ার দায়িত্ব ফরজে আইনের মতো সকলের উপরই

বর্তায়। তবে ব্যবধান হলো, কিছু সংখ্যক লোকের আদায়ের দ্বারা ফরজে কিফায়ার দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়, পক্ষান্তরে ফরজে আইন একজনের আদায়ের দ্বারা আরেকজনের দায়িত্ব আদায় হয় না।" (আলমুগনি – ৯/১৯৬)

দুই.

অনেকে মনে করেন, কিছু সংখ্যক লোক করতে থাকলেই বাকিরা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। যেমন কিছু সংখ্যক লোক জিহাদ করতে থাকলে বাকিরা না করলেও সমস্যা নেই।

আসলে ঢালাওভাবে কথাটা সঠিক নয়। কিছু সংখ্যক লোক করতে থাকলেই যে বাকিরা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে, বিষয়টি এমন নয়। বরং প্রয়োজন পরিমাণ লোক ফরজটি আদায় করলে এবং কাজটি যথাযথ সম্পাদিত হলেই কেবল বাকিরা দায়িত্বমুক্ত হবে। পক্ষান্তরে কাজটি কিছু লোক করতে থাকল ঠিকই, কিন্তু কাঙ্খিত স্তরে কাজটি সম্পাদিত হল না, তাহলে যারা চেষ্টা করল না, তারা সকলেই গুনাহগার হবে।

যেমন ধরুন, মুসলিম মাইয়েতের জানাযা ও কাফন দাফনের ব্যবস্থা করা, একটি ফরজে কিফায়া। এখন কোনো এলাকায় যদি মহামারিতে অসংখ্য লোক মারা যায়, তাহলে তাদের কাফন দাফনের দায়িত্ব সকলের। এ অবস্থায় কিছু লোক যদি সকলের কাফন দাফন সেরে ফেলে, তাহলে বাকিরা দায়িত্বমুক্ত হবে। পক্ষান্তরে কিছু লোক কাজটি করতে থাকল, কিন্তু মৃতের সংখ্যা অধিক হওয়ায় তাদের পক্ষে তা সম্পন্ন করা সম্ভব হল না। ফলে কিছু লাশ পচে গলে দুর্গন্ধ ছাড়াতে থাকল। এক্ষেত্রে অবশ্যই যারা কাজটি সম্পাদন করার চেষ্টা করল না, তারা সকলেই ফরজ ত্যাগের দায়ে গুনাহগার হবে।

তদ্রূপ স্বাভাবিক অবস্থায় জিহাদ ফরজে কিফায়া হওয়ার অর্থ এই নয় যে, কিছু মুসলিম জিহাদ করতে থাকলেই গোটা উম্মাহ দায়মুক্ত হয়ে যাবে। বরং উম্মাহ তখনই দায়মুক্ত হবে, যখন জিহাদের ফরজ দায়িত্বটি যথাযথ আদায় হবে। জিহাদের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে এবং সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের দ্বীন, সম্পদ ও ইজ্জত আব্রু শত্রু থেকে নিরাপদ ও শঙ্কামুক্ত হবে এবং শত্রুরা মুসলিমদের শক্তি ও প্রতাপের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে। যতক্ষণ উক্ত উদ্দেশ্য অর্জিত না হবে, ততক্ষণ যারাই এর জন্য চেষ্টারত থাকবে না, তারা সকলেই ফরজ ত্যাগের দায়ে গুনাহগার হবে। আরও দেখুন (রদ্দুল মুহতার:

৪/১২৪, মুগনিল মুহতাজ: ৬/১৬, আলওয়াজিয ফি উসূলিল ফিকহ: ৩৬) (Fatwaa.org)

দ্বীনি ও দুনিয়াবি ইলমের পার্থক্য:

ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। ইলমের মাধ্যমে হযরত আদম আ. ফেরেশতাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। ইলমের মাধ্যমেই মানুষ তার রবকে চিনতে পারে, ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা এবং হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। উন্নতি-অগ্রতি এবং উভয় জাহানের শান্তি-সফলতা ও কামিয়াবীর সোপানে আরোহণ করতে পারে । ইলমের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ "দ্বীনী ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।" (সুনানে ইবনে মাজাহ – ২২৪)

আমাদের দেশের অনেক বিজ্ঞজন এই হাদীসে উল্লেখিত ইলম বা বিদ্যা দ্বারা ব্রিটিশ সিলেবাস তথা দুনিয়াবী ইলমের উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন, যা স্পষ্টই ভুল। কারণ যে ইলমের দ্বারা মানুষ নিজের রবকে চিনতে পারে না , যে ইলমের দ্বারা মানুষ প্রকৃত অর্থে মানুষ হতে পারে না, যে ইলম গুনাহ থেকে বাঁচতে শিখায় না তাকে ইলম বলে না। দুনিয়াবী ইলম তো দূরের কথা, দ্বীনি ইলম অর্জন হওয়ার পরও কেউ যদি গুনাহ থেকে বেঁচে না থাকে, নিজেকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়তে না পারে, তাহলে তার ইলমকেও শরীয়াতের দৃষ্টিতে ইলম বলা হবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেছেন,

'নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে কেবল আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করে' (সূরা ফাতির – ২৮)।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, প্রকৃত আলেম তারাই যারা আল্লাহকে ভয় করে। অতএব, ইলম তথা শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি হতে হবে খোদা ভীতির উপর আর দ্বীনি ইলমের ভিত্তিও হলো খোদা ভীতির উপর। তাই হাদীসে বর্ণিত ইলম দ্বারা যে খালেস দ্বীনি ইলম উদ্দেশ্য তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে তাহলে দুনিয়াবী ইলম হাসিল করা কি জায়িয নেই? এর উত্তর হলো: ফরয পরিমাণ ইলম অর্জনের পরে কেউ যদি দুনিয়াবী ইলম অর্জন করে, চাই দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ হাসিলের জন্য করুক বা দ্বীনের খেদমতের নিয়তে করুক, তাতে কোনো সমস্যা নেই; বরং শরীয়ত মোতাবেক চলে দ্বীনের খেদমতের উদ্দেশ্যে যদি কেউ দুনিয়াবী ইলম অর্জন করে তাহলে তাতে সে সাওয়াবেরও আশা করতে পারে। কারণ হাদীসে এসেছে 'কর্মের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভর করে' (বুখারী)
কিন্তু বাস্তব কথা হলো,স্কুল-কলেজে ফরয পরিমাণ ইলম শিক্ষা দেয়া হয় না এবং সেখানে শরীয়ত মোতাবেক চলতে উৎসাহিত করা হয় না; বরং সেখানে এমন অনেক মতবাদ শিক্ষা দেয়া হয় যা ঈমানের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং অনেক স্কুলের পরিবেশই এমন যে, কেউ চাইলেও শরীয়ত মোতাবেক চলতে পারে না।

আজকাল লাখো মানুষ দ্বীনের সঠিক বুঝ না থাকার কারণে নিজের বুঝকে সঠিক মনে করে নিজের প্রাণপ্রিয় সন্তানকে দু- চার পয়সার লোভে কিংবা দুনিয়াবী সম্মানের আশায় দ্বীনী ইলম শিক্ষা না দিয়ে দুনিয়াবী ইলম নামের ব্রিটিশদের তৈরি করা শিক্ষা কারিকুলাম পড়াচ্ছে।
আবার কেউ কেউ তো দ্বীনি শিক্ষার ব্যাপারে নিম্নোক্ত মন্তব্য করতেও কুণ্ঠা বোধ করে না।

১. '(কওমী) মাদরাসার বিদ্যা ফকীরি বিদ্যা' (নাঊযুবিল্লাহ)। অথচ কুরআন-হাদীসের ইলমের ব্যাপারে এমন মন্তব্য করার কারণে ঐ লোকের ঈমান ধ্বংস হওয়ার যথেষ্ট আশংকা রয়েছে।
২. 'মাদরাসায় লেখা পড়া করলে না খেয়ে মরবে'। অথচ দ্বীনি ইলম অর্জন করা কোনো লোক না খেয়ে মরেছে এর কোন প্রমাণ বা উদাহরণ তারা দেখাতে পারে না এবং পারবেও না ইনশাআল্লাহ। কারণ আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় বান্দাদেরকে না খাইয়ে মারবেন না।
৩. কিছু দ্বীনদার লোক মনে করে সন্তানকে (কওমী) মাদরাসায় পড়ানোর দরকার নেই। স্কুল-কলেজে পড়াবো। তারপর সন্তান বড় হলে তাকে দ্বীনের রাস্তায় মেহনত করার সুযোগ করে দিয়ে দ্বীনদার বানিয়ে নিব। অথচ স্কুলে পড়ে সে বদ্দীন হবেনা

তার গ্যারান্টি কে দিবে? অথবা দ্বীনদার হওয়ার সুযোগ পাওয়ার আগেই সে মারা গেলে তার পরিণতি কী হবে? তা মোটেও ভেবে দেখে না।

মানুষ যাতে দ্বীনি শিক্ষা ও দুনিয়াবী শিক্ষার পার্থক্য বুঝতে পেরে নিজেকে এবং নিজের সন্তানকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারে, তাই নিম্নে দ্বীনি শিক্ষা ও দুনিয়াবী শিক্ষার মধ্যে বাস্তব কিছু পার্থক্য তুলে ধরা হলো:

১. দ্বীনি ইলম অর্জন করা পৃথিবীর মহামানব তথা নবী রাসূলগণের ওয়ারিশ। কেননা নবী-রাসূলগণ শুধু ইলমের ওয়ারিশ বানান, অর্থ-কড়ির নয়। আর এরাও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইলম শিখে, টাকা-পয়সার জন্য নয়। (মাজমাউয যাওয়েদ ৫২৩)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী ইলম অর্জন করা ঐ শিক্ষার সিলেবাস যারা তৈরি করেছে তাদের ওয়ারিশ। নবী রাসূলগণের ওয়ারিশ নয়, কেননা তারা ইলম অর্জনই করে টাকা-পয়সা কিংবা কোনো পদ হাসিলের জন্য।

২. দ্বীনি ইলম অর্জনকারীদের কে নবীগণের বাস্তব ওয়ারিশ বানানোর জন্য তাদেরকে ঈমান, আমল, দাওয়াত, তা'লীম, তাযকিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী ইলম অর্জনকারীদেরকে কীভাবে দুনিয়া উপার্জন করা যাবে তা শিক্ষা দেওয়া হয়। ঈমান আমল সেখানে গুরুত্বহীন বিষয়।

৩. যারা দ্বীনি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয় তাদের সম্মানার্থে ফেরেশতারা নিজেদের নূরের পাখা বিছিয়ে দেয়। (আবূ দাউদ হা.নং ৩৬৪১)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী ইলমের ছাত্রদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের পাখা বিছানোর কোনো হাদীস নেই।

৪. দ্বীনি ইলম অর্জনকারীরা যেহেতু ইবাদত বন্দেগী করে থাকে, তাই তাদের দ্বারাই আল্লাহ তা'আলার দুনিয়াতে মানুষ পাঠানোর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হচ্ছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে মানুষ পাঠিয়েছেন তার ইবাদত করার জন্য। (সূরা যারিয়াতঃ ৫৬)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী ইলম অর্জনকারীদের দ্বারা আল্লাহ তা'আলার দুনিয়ায় মানুষ পাঠানোর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হচ্ছে না। কারণ তারা সাধারণত আল্লাহর নির্দেশ মতো চলে না। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি উলামায়ে কেরামের সুহবতে আসে বা দাওয়াতের কাজে জুড়ে থাকে সেটা ভিন্ন কথা।

৫. খালেস দ্বীনি ইলম অর্জন করে কেউ বেকার থাকে না। তাদের কারণে দেশের বেকারত্ব বাড়ে না; বরং তারা একদিকে নিজ দেশে দ্বীনের খেদমত করছেন অন্য

দিকে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইমাম, মুয়াযিন, মাদরাসার শিক্ষক হয়ে কিংবা অন্য কোন খেদমত করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছেন, যার দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হচ্ছে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী ইলম অর্জন করা অনেকেই বেকার থাকছে। কারণ দুনিয়াবী ইলম হলো 'কর্মমুখী ইলম' অর্থাৎ এ ইলম অর্জনকারীরা দুনিয়ার বিভিন্ন কর্ম করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে কর্মের সুযোগ কম থাকায় আর কর্মের প্রার্থী বেশি হওয়ায় অনেক বড় বড় ডিগ্রিধারীরাও বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে। শেষ অবধি বেকারত্বের কারণে কেউ অর্থ উপার্জনের অনৈতিক পথ বেছে নিচ্ছে, আবার কেউবা ছিনতাই রাহাজানির মতো ভয়ংকর পথ বেছে নিতে দ্বিধা করছে না।

৬. দ্বীনি ইলমের শিক্ষাকেন্দ্র কওমী মাদারাসা। দ্বীনী ইলমের পাশাপাশি প্রয়োজন পরিমাণ বাংলা, অংক, ইংরেজী ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হয়। আর এখানে সরকারের কোন অনুদান নেয়া হয় না। যার কারণে সরকার নিজের খেয়াল-খুশি মোতাবেক এখানকার সিলেবাস পরিবর্তন করতে পারে না।

পক্ষান্তরেঃ স্কুলবকলেজে প্রয়োজন পরিমাণ দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেওয়া হয় না। আর স্কুল কলেজ সরকারী হওয়ায় বা এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ সরকারের অনুদান গ্রহণ করায় সরকার চাইলেই নিজের খেয়াল-খুশি মোতাবেক সিলেবাস পরিবর্তন করতে পারে। আর এতে যে কী পরিমাণ ক্ষতি হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৭. কওমী মাদরাসায় ফরযে আইন এবং ফরযে কেফায়া উভয় প্রকারের ইলম শিক্ষা দেয়া হয়, যার দ্বারা এখানকার শিক্ষার্থীরা নিজেকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতা থেকে বাঁচাতে পারে আবার সাধারণ মানুষকেও সিরাতে মুস্তাকীম এর উপর পরিচালনার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী ইলমের কেন্দ্র স্কুল কলেজে ইলমের কিছু তো নেই; বরং তাদের সিলেবাসে ঈমান বিধ্বংসী অনেক মতবাদ রয়েছে। যার একটি মানাই ঈমান ধ্বংস হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যেমনঃ জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে বাংলাদেশের মূল সমস্যা বলে আখ্যায়িত করা।

৮. দ্বীনি ইলম অর্জনকারীদেরকে প্রকৃত অর্থে মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়। তাদেরকে পিতা মাতা, ভাই বোন, স্বামী স্ত্রী, সন্তান সন্ততি, গুরুজন, প্রতিবেশী এমনকি প্রাণীর হকও শিক্ষা দেওয়া হয়। যার ফলে তারা প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে উঠে।

পক্ষান্তরেঃ স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদেরকে প্রকৃত মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয় না। পত্রিকা খুললেই স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটির ছাত্রদের কীর্তি দেখে চোখ ধাঁদিয়ে যায়। আজকাল তো তারা বিশেষভাবে শিক্ষকদের পিটাতে বেশ দক্ষতা অর্জন করেছে। তাছাড়া ওখানকার ছাত্ররাই তো পথে-ঘাটে ইভ-টিজিং করে বেড়াচ্ছে ।

৯. দ্বীনি ইলম অর্জনকারীরা নিজ পিতা-মাতার জানাযা নামায পড়ানোর যোগ্যতাও অর্জন করে ।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী ইলম অর্জন করা কোন লোকেরই এই যোগ্যতা নেই যে, সে ঐ বিদ্যা দিয়ে পিতা-মাতার জানাযা নামায পড়াবে।

১০. দ্বীনি ইলম অর্জনকারীরা নিজ পিতা মাতার জন্য সদকায়ে জারিয়া স্বরূপ। অর্থাৎ পিতা মাতা মৃত্যুর পরও কিয়ামত পর্যন্ত আলেম তথা নেক সন্তানের নেক আমলের সওয়াব পেতে থাকবে। (তিরমিযী ১৩৭৬)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী ইলম অর্জনকারীরা অনেকেই নিজ পিতা মাতার জন্য গুনাহে জারিয়া স্বরূপ। অর্থাৎ পিতা মাতা মৃত্যুর পরও তাদের বদ আমলের ভাগীদার হতে থাকে। কারণ তারা তাদেরকে কোনো নেক আমল শিক্ষা দেয়নি এবং জীবিত অবস্থায় তাদেরকে গুনাহের কাজ করতে নিষেধ করেনি।

১১. দ্বীনি ইলম অর্জনকারীরা দুনিয়ার মানুষকে জাহান্নাম থেকে বাঁচার পথ দেখায়। এজন্যই তারা বিভিন্ন মাদরাসা, মসজিদে, মাঠে ময়দানে কুরআন-হাদীসের কথা জনসাধারণকে শুনিয়ে থাকে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী ইলম অর্জনকারীরা অনেকেই মানুষকে জাহান্নামের পথ দেখায়। যেমনঃ তারা নাটক, সিনেমা ইত্যাদি তৈরি করে তা দেখার জন্য মানুষকে প্রেক্ষাগৃহে যেতে উদ্বুদ্ধ করে। অনেকে লেখনীর মাধ্যমে নাস্তিক্যবাদ প্রচার করে। তাছাড়া আরো অগণিত উদাহরণ আপনি ভাবলেই পেয়ে যাবেন।

১২. হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী দ্বীনি ইলম অর্জনকারীরা যখন ইলম অর্জনের জন্য বসে তখন ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে, আল্লাহর রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেয় এবং তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়। (জামিউ বয়ানিল ইলম ৪৫)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে এ ধরণের কোনো ফযিলত নেই; বরং তারা তো শিখতে বসে ক্লাস রুমেও অনেক গুনাহের কাজ করে। যেমনঃ ছেলেদের মেয়েদেরকে দেখা, মেয়েদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করা।

১৩. দ্বীনি ইলম অর্জনকারীরা ইসলাম ধর্ম টিকিয়ে রাখছে। কারণ ইলম শিক্ষার ধারা

বন্ধ হয়ে গেলে ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে ইসলাম উঠে যাবে। আর সাধারণ মানুষ যে যতটুকুই দ্বীন পালন করছে বা দ্বীনের চর্চা করছে তা এদের উসিলায় করছে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী ইলম অর্জন করা লোকেরা ইংরেজদের অনুকরণ করে এবং তাদের অর্থে পরিচালিত এনজিওগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করে ইসলাম ধর্মের অস্তিত্ব মিটিয়ে দিতে সাহায্য করছে। বাংলাদেশে দিন দিন খৃষ্টানদের সংখ্যা বেড়ে চলাই এর প্রমাণ বহন করে। সামান্য অর্থের লোভে বাংলাদেশী ছেলে মেয়েরাই তো এসব এনজিওতে কাজ করছে।

১৪. হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী দ্বীনি ইলম অর্জনকারীদের শেষ পরিণাম কল্যাণকর হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান তাকেই দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করেন। (জামেউ বয়ানিল ইলম – ৮০)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী ইলম অর্জনকারীদের শেষ পরিণাম অজানা; বরং বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তাদের শেষ পরিণাম সুখকর হবে না। যারা আল্লাহর হুকুম মানবে না তাদের শেষ পরিণতি খারাপ হওয়াই স্বাভাবিক।

১৫. হাদীসের ভাষ্য মোতাবেক 'দুনিয়ার গোটা সৃষ্টিজগত দ্বীনী ইলম অর্জনকারীদের জন্য দু'আ করে'। (আবূ দাঊদ – ৩৬৪১)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী ইলম অর্জনকারীরা এ দু'আ থেকে বঞ্চিত থাকে।

১৬. দ্বীনী ইলম অর্জনকারীদের লকব বা সনদ চিরস্থায়ী। বেহেশতে প্রবেশ করেও তারা এ উপাধিতে ভূষিত হবেন।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী ইলম অর্জনকারীদের মশাই টানানোর পরে খুলছিলাম সবগুলা সনদ একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। অবসর গ্রহণের পরই তাদের সনদ অনেকাংশে অকেজো হয়ে পড়ে। আর মরার পর কবরে ও হাশরে এ সনদের কোনো মূল্যায়নই হবে না।

১৭. দ্বীনী ইলম অর্জনকারীদের জন্য তাদের পিতা মাতা বা অন্য যে কেউ যত টাকা খরচ করে তাতে সে বেহিসাব সাওয়াব পায়। (সহীহ ইবনে হিব্বান ৪৬২৯)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী ইলম অর্জনকারীদের জন্য টাকা খরচ করলে সাওয়াব হবে এমন কোনো কথা কুরআন হাদীসে নেই; বরং অনেক ক্ষেত্রে তাদের পিছনে টাকা ব্যয় করলে গুনাহ হয়। যেমনঃ অভিনয়, নাচ-গান, প্রাণীর ছবি আঁকা ইত্যাদি শিখার ক্ষেত্রে যে টাকা ব্যয় করা হয় তাতে গুনাহ হয়।

১৮. দ্বীনী ইলম অর্জনকারীরা যদি ইলম শিক্ষা করা অবস্থায় ইন্তেকাল করে তাহলে সে শহীদের মর্যাদা লাভ করে। (আবূ দাঊদ – ৩৬৪১)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী ইলম অর্জনকারীরা শিক্ষাকালীন অবস্থায় মারা গেলে এ মর্যাদা পাবে না; বরং গুনাহের কোনো কিছু শিক্ষারত অবস্থায় মারা গেলে খারাপ পরিণতির আশংকাই প্রবল।

১৯. হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী দ্বীনী ইলম অর্জনকারীরা মহান আল্লাহ তা'আলার পরিবারের সদস্য। সুতরাং পরকালে তাদের বিশেষ পাওয়ার থাকবে । (মুসনাদে আহমাদ – ৩/১২৮)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী ইলম অর্জনকারীরা আল্লাহর পরিবারের সদস্য হওয়া তো দূরের কথা তারা অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহর শত্রু সাব্যস্ত হয়ে যায়।

২০. সর্বোপরি দ্বীনি ইলম অর্জনকারীদের মাঝে খোদাভিরুতা, নম্রতা, ভদ্রতা, এবং চারিত্রিক উৎকর্ষতার গুণ থাকার কারণে তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং বিভিন্ন ফেতনায় জর্জরিত সমাজকে জাহিলিয়াতের অতল গহবর থেকে উঠিয়ে হেদায়েতের আলোকে উদ্ভাসিত করতে পারে। আদর্শ, সুশীল সমাজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। যা দেশ ও জাতির জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লক্ষণ।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী ইলম অর্জনের দ্বারা অসামাজিক কার্য-কলাপ। যেমনঃ হত্যা, লুণ্ঠন, রাহাযানী, ধর্ষণ, ইভটিজিং, গাড়ী ভাংচুর, মারামারি, কাটাকাটি, নেশা মদ্যপান ইত্যাদি জঘন্য কর্মকান্ড সংঘটিত হওয়ার কারণে আদর্শ সমাজও বর্বর যুগের অসভ্য সমাজে পরিণত হতে বাধ্য। আজ নৈতিকতা বিবর্জিত, ধর্মহীন শিক্ষার কারণেই দেশজুড়ে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। তারপরও কি আমরা সন্তানদেরকে দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত করার দুঃসাহস দেখাতে পারি!(ইসলামিক জিন্দেগি)

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ও ইসলামী শিক্ষা:

ইসলামে শিক্ষা একটি অপরিহার্য বিষয়। এটি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন, নৈতিক বিকাশ এবং ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির অন্যতম প্রধান মাধ্যম। ইসলাম মানবজাতির আত্মপরিচয় গঠন, সুনাগরিক তৈরি এবং কল্যাণকামী মনোভাব প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা মানুষকে কেবল জ্ঞানীই করে না, বরং তাকে সত্যিকার অর্থে একজন নৈতিক, দায়িত্বশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। তাই ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা শুধু পেশাগত দক্ষতার মাধ্যম নয়, বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা গঠনের ভিত্তি।

শিক্ষাকে সাধারণভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১. জাগতিক শিক্ষা

২. দ্বীনী শিক্ষা।

জাগতিক শিক্ষা হলো সেই জ্ঞান যা মানুষের পার্থিব জীবন পরিচালনায় সহায়তা করে, যেমন বিজ্ঞান, চিকিৎসা, গণিত, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ইত্যাদি। এসব জ্ঞানের মূল উৎস হলো অভিজ্ঞতা, গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণ। আধুনিক সভ্যতার উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য এই শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে দ্বীনী শিক্ষা হলো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির জ্ঞান, যা মূলত ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে হালাল-হারাম, ফরজ-ওয়াজিব এবং নৈতিক জীবনাচরণের সঠিক দিকনির্দেশনা দ্বীনী শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হয়। এই দুই ধরনের শিক্ষার মধ্যে ভারসাম্য না থাকলে মানুষের জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান সময়ে মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। এর মাধ্যমে মানুষ প্রযুক্তি, দক্ষতা এবং পেশাগত উৎকর্ষ অর্জন করে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম হয়েছে। চিকিৎসা, যোগাযোগ, কৃষি, শিল্প ও অর্থনীতি সব ক্ষেত্রেই আধুনিক শিক্ষার প্রভাব সুস্পষ্ট। তবে এর কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এই শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, যার ফলে সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, চারিত্রিক দুর্বলতা, অশ্লীলতা ও বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে দেখা যায়। বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তির সঠিক দিকনির্দেশনা ও ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবে তরুণ প্রজন্ম মোবাইল, ইন্টারনেট ও বিভিন্ন ডিজিটাল মাধ্যমে অপব্যবহারের দিকে ঝুঁকে পড়ছে, যা তাদের ব্যক্তিজীবন ও সমাজ উভয়ের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

অন্যদিকে ইসলামিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এই শিক্ষা মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করে এবং তাকে নৈতিকভাবে পরিশুদ্ধ করে তোলে। কুরআন ও হাদিসভিত্তিক জ্ঞান মানুষের চিন্তা চেতনা, আচার-আচরণ ও জীবনধারাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। ইসলামিক শিক্ষা মানুষকে শুধু দুনিয়ার সফলতার দিকে নয়, বরং আখিরাতের চিরস্থায়ী মুক্তির দিকেও পথ দেখায়। তাই প্রকৃত মানুষ গঠনের জন্য এই শিক্ষার

কোনো বিকল্প নেই। দ্বীনী জ্ঞানের আলো ছাড়া মানুষের জীবন আংশিক ও অসম্পূর্ণ থেকে যায়।
বর্তমান সময়ে একটি সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

আধুনিক শিক্ষা ও ইসলামিক শিক্ষার মধ্যে একটি সুন্দর সেতুবন্ধন তৈরি করা গেলে সমাজে ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন সম্ভব। উলামায়ে কিরাম এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত পেশাজীবীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান ও সহযোগিতা থাকা উচিত, কারণ সমাজ গঠনে উভয়েরই ভূমিকা অপরিহার্য। এমন একটি শিক্ষাধারা গড়ে তোলা প্রয়োজন যা কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতি বজায় রেখে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করবে। একইসাথে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার অন্ধ অনুকরণ পরিহার করে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আধুনিক জ্ঞানকে মূল্যায়ন করা জরুরি।
সার্বিকভাবে বলা যায়, আধুনিক শিক্ষার পেশাগত দক্ষতা এবং ইসলামিক শিক্ষার নৈতিক ও আত্মিক উৎকর্ষ এই দুইয়ের সমন্বয়ই একটি আদর্শ, সুশৃঙ্খল ও কল্যাণমুখী সমাজ গঠনের ভিত্তি। এই ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাত উভয় দিকেই সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। (মাসিক আল কাউসার)

৪) ব্যক্তিগত জীবনে ইলমের প্রভাব

ইলম কিভাবে ব্যক্তিত্ব গঠন করে:

ইলম (জ্ঞান) মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের মূল ভিত্তি। ইসলাম মানুষকে শুধু ইবাদতের নিয়ম শেখায় না, বরং তার চিন্তা, আচরণ, নৈতিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজে চলার পদ্ধতি সবকিছুকে একটি সুশৃঙ্খল ও ভারসাম্যপূর্ণ কাঠামোর মধ্যে গড়ে তোলে। এই পূর্ণাঙ্গ গঠনের কেন্দ্রবিন্দু হলো "ইলম"। একজন মানুষের ভেতরের পরিবর্তন শুরু হয় তার জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে। জ্ঞান ছাড়া মানুষ অনেক সময় নিজের উদ্দেশ্য, দায়িত্ব এবং জীবনের সঠিক দিক সম্পর্কে অস্পষ্ট থেকে যায়।

ইলম মানুষকে অন্ধ অনুসরণ থেকে বের করে আনে এবং তাকে যুক্তি, প্রমাণ ও গভীর চিন্তার দিকে পরিচালিত করে। একজন অজ্ঞ ব্যক্তি অনেক সময় আবেগ, পরিবেশ বা সমাজের প্রভাবে সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। ইসলাম মানুষকে চিন্তাশীল ও সচেতন হতে উৎসাহিত করে, যাতে সে প্রতিটি কাজ বুঝে শুনে সম্পাদন করতে পারে।

ইসলামে জ্ঞানকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, জ্ঞানী ও অজ্ঞ মানুষের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য করা হয়েছে। জ্ঞান মানুষের চিন্তার গভীরতা বাড়ায়, সত্যভমিথ্যা পার্থক্য করার ক্ষমতা দেয় এবং তাকে জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এর ফলে তার ব্যক্তিত্বে দৃঢ়তা, পরিপক্কতা এবং ভারসাম্য তৈরি হয়। একজন জ্ঞানী মানুষ সহজে বিভ্রান্ত হয় না, কারণ তার কাছে মানদণ্ড হলো জ্ঞান ও প্রমাণ।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?" (সূরা জুমার – ৯)

ইসলামে জ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নৈতিক উন্নয়ন। প্রকৃত ইলম মানুষকে অহংকারের দিকে না নিয়ে গিয়ে বিনয়ের দিকে নিয়ে যায়। কারণ জ্ঞান মানুষকে তার নিজের সীমাবদ্ধতা বুঝতে সাহায্য করে। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি যত বেশি জানে, তত বেশি উপলব্ধি করে যে তার জ্ঞান সীমিত। এই উপলব্ধি তার মধ্যে বিনয়, সহনশীলতা, ধৈর্য এবং আত্মসমালোচনার মানসিকতা তৈরি করে। (ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন)

ইলম মানুষকে নিজের পরিচয় এবং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করে। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বোঝে যে সে কেন সৃষ্টি হয়েছে, তার দায়িত্ব কী, এবং তার শেষ গন্তব্য কোথায়। এই সচেতনতা তার জীবনকে উদ্দেশ্যমূলক করে তোলে এবং তাকে অনর্থক কাজ ও গাফলতি থেকে দূরে রাখে।

ইসলাম শিক্ষা দেয় যে জ্ঞান শুধু জানার জন্য নয়, বরং সেই জ্ঞান অনুযায়ী আমল করার জন্য। তাই ইলম ও আমল একে অপরের পরিপূরক। জ্ঞান যদি আমলে রূপ না নেয়, তবে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। (তালিমুল মুতাআল্লিম)

প্রকৃত জ্ঞান মানুষকে অহংকারী করে না, বরং তাকে বিনয়ী করে তোলে। কারণ সে বুঝতে পারে তার জ্ঞান সীমিত এবং আল্লাহর জ্ঞান অসীম। এই উপলব্ধি মানুষের মধ্যে তাকওয়া আল্লাহভীতি সৃষ্টি করে, যা তার ব্যক্তিত্বকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাকে গুনাহ থেকে দূরে রাখে।
কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

“আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে।” (সূরা ফাতির – ২৮)

ইলম মানুষের সামাজিক জীবনকেও সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ করে তোলে। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি অন্যদের সম্মান করে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। সে শুধু নিজের উন্নতি নিয়ে চিন্তা করে না, বরং সমাজের কল্যাণ ও শৃঙ্খলা নিয়েও সচেতন থাকে।
ইসলাম শিখায় যে উত্তম চরিত্রই একজন মানুষের আসল পরিচয়। তাই জ্ঞান মানুষকে শুধু ব্যক্তিগতভাবে উন্নত করে না, বরং সামাজিকভাবে দায়িত্বশীলও করে তোলে। (রিয়াজুস সালেহীন)

রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
“তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম।” (সহীহ বুখারী – ৩৫৫৯)

ইলম মানুষকে আত্মশুদ্ধির পথে পরিচালিত করে এবং তার ভেতরের অন্ধকার দূর করে আলোয় আলোকিত করে। জ্ঞান মানুষের হৃদয়ে সঠিক চিন্তা, সঠিক বিশ্বাস এবং সঠিক কর্মের সমন্বয় ঘটায়। এর ফলে সে শুধু নিজের জন্য নয়, বরং সমাজের জন্যও কল্যাণের উৎসে পরিণত হয়।

ইলমই মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের মূল ভিত্তি এবং ইসলামী জীবনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। জ্ঞান ছাড়া ব্যক্তি যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনি জ্ঞান যদি আমল ও আত্মশুদ্ধি ছাড়া হয়, তবে সেটিও পরিপূর্ণতা লাভ করে না। তাই ইসলামে ইলম, আমল এবং আখলাক এই তিনের সমন্বয়েই একজন আদর্শ মানুষ গড়ে ওঠে, যা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার দিকে নিয়ে যায়।

ইলম ও আত্মশুদ্ধি:

ইসলামে জ্ঞান বা "ইলম" শুধু তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম নয়, বরং এটি মানুষের চিন্তা, আচরণ এবং নৈতিক গঠনে পরিবর্তন আনার একটি শক্তিশালী উপাদান। একইভাবে আত্মশুদ্ধি বা "তাযকিয়া" হলো অন্তরের পরিশুদ্ধি, যা মানুষের ইবাদত, চরিত্র এবং সামাজিক আচরণকে সুন্দর, পরিশীলিত ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উপযোগী করে তোলে। ইসলামি স্কলারদের মতে, ইলম ও আত্মশুদ্ধি একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত, একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটি পূর্ণতা লাভ করে না। কারণ জ্ঞান যদি অন্তরকে পরিশুদ্ধ না করে, তাহলে তা অনেক সময় অহংকার, আত্মতৃপ্তি, কিংবা বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আবার আত্মশুদ্ধি যদি সঠিক জ্ঞানের ভিত্তিতে না হয়, তাহলে তা অন্ধ আবেগ বা ভুল দিকনির্দেশনার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

ইসলামে ইলম অর্জনের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন এবং সঠিক জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ইলম মানুষকে সত্যবমিথ্যার পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করে এবং তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। তবে এই জ্ঞান তখনই প্রকৃত অর্থে উপকারী হয়, যখন তা আমল ও তাকওয়ার সাথে যুক্ত থাকে। ইমাম ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেন যে,

ইলম তখনই উপকারী হয় যখন তা আমল ও তাকওয়ার সাথে যুক্ত থাকে। শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জনই যথেষ্ট নয়, যদি তা বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত না হয় এবং মানুষের চরিত্রে পরিবর্তন না আনে। (ইমাম ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ)

ইলম মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করে এবং তাকে গুনাহ থেকে দূরে রাখে। প্রকৃত জ্ঞান মানুষের হৃদয়কে জাগ্রত করে, তাকে আত্মসমালোচনায় উদ্বুদ্ধ করে এবং ধীরে ধীরে তার জীবনে তাকওয়া ও বিনয় সৃষ্টি করে। (কিতাবুল ইলম)

ইলম এবং আত্মশুদ্ধির মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ও অবিচ্ছেদ্য। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন যে,
যে ইলম মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে না, তা তার জন্য উপকারের পরিবর্তে ক্ষতির কারণ হতে পারে। কারণ এমন জ্ঞান মানুষের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি করে, আত্মতৃপ্তি বাড়ায় এবং তাকে সত্য গ্রহণে বাধা দেয়। অন্যদিকে, ইলম যখন আত্মশুদ্ধির সাথে যুক্ত হয়, তখন তা মানুষকে বিনয়ী, সৎ, দায়িত্বশীল এবং আল্লাহভীরু করে তোলে। (মাদারিজুস সালেকীন)

আত্মশুদ্ধি বা তাযকিয়া হলো অন্তরের রোগসমূহ যেমন অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ, কপটতা, রিয়া লোক দেখানো আমল, লোভ ও গাফলত দূর করে হৃদয়কে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনা। এটি একজন মুমিনের আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল ভিত্তি। ইসলামী জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, মানুষের বাহ্যিক আমল তখনই গ্রহণযোগ্য ও ফলপ্রসূ হয়, যখন তার অন্তর পরিশুদ্ধ থাকে। যদি অন্তর কলুষিত থাকে, তাহলে বাহ্যিক ইবাদতও পূর্ণতা লাভ করে না এবং তার প্রকৃত প্রভাব ব্যক্তিজীবনে প্রকাশ পায় না। (ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন)

ইসলামী ইতিহাসে দেখা যায় যে, প্রকৃত আলেমগণ সবসময় জ্ঞানকে আত্মশুদ্ধির সাথে মিলিয়ে চলতেন। তাদের কাছে ইলম ছিল শুধু পাঠ বা বক্তৃতার বিষয় নয়, বরং তা ছিল জীবন গঠনের বাস্তব অনুশীলন। যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে কিন্তু বিনয় অর্জন করে না, সে প্রকৃত আলেম নয়। (আল-আথার, ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ উক্তি

সংকলন) এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, জ্ঞান তখনই পূর্ণতা পায় যখন তা মানুষের চরিত্রে বিনয়, নম্রতা এবং আল্লাহভীতি সৃষ্টি করে।

এ থেকে বোঝা যায় যে, ইসলামে ইলমের উদ্দেশ্য শুধু জানা বা তথ্য অর্জন করা নয়, বরং নিজেকে পরিবর্তন করা, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা এবং সমাজে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করা। যে জ্ঞান মানুষের আচরণে পরিবর্তন আনে না, সে জ্ঞান ইসলামের দৃষ্টিতে অসম্পূর্ণ। আর যে জ্ঞান আত্মাকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনে, সেটিই প্রকৃত উপকারী ইলম।

মূলত, ইসলামে ইলম ও আত্মশুদ্ধি একে অপরের পরিপূরক। ইলম মানুষকে সঠিক পথ চিনতে সাহায্য করে, আর তাযকিয়া সেই পথে চলার জন্য অন্তরকে প্রস্তুত করে। এই দুইয়ের সমন্বয়েই একজন মানুষ প্রকৃত অর্থে পরিশুদ্ধ, নৈতিকভাবে উন্নত এবং আল্লাহভীরু বান্দা হিসেবে গড়ে ওঠে, যা তাকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গায় সফলতার দিকে নিয়ে যায়।

ইলম ও ধৈর্যশীলতা:

ইলম ও ধৈর্যশীলতা

ইসলামে “ইলম” (জ্ঞান) এবং “সবর” (ধৈর্য) মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের দুইটি মৌলিক স্তম্ভ। ইলম মানুষের অন্তরে আলো জ্বালায় যার মাধ্যমে সে সত্যকে চিনতে পারে; আর ধৈর্য সেই সত্যের উপর অবিচল রাখার শক্তি দেয়। জ্ঞান পথ দেখায়, আর ধৈর্য সেই পথে চলতে সাহায্য করে।

ইহইয়াউ উলূমিদ্দীনে ইমাম আল গাজালী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

“জ্ঞান এমন এক আলো, যার মাধ্যমে মানুষ তার অন্তর ও কর্মকে সঠিকভাবে দেখতে পারে।”

এই আলো পাওয়ার জন্য শুধু আগ্রহই যথেষ্ট নয়; ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং সময় বিনিয়োগ অপরিহার্য।

ইলম অর্জনের পথ কখনোই সহজ নয়; এটি দীর্ঘ, পরিশ্রমসাধ্য এবং কষ্টপূর্ণ। এজন্য যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরে না, সে জ্ঞানের স্বাদও ঠিকভাবে আস্বাদন করতে পারে না।

দীর্ঘসময়ের অধ্যয়ন, ক্লান্তি সহ্য করা, রাত জাগা, নিয়ত ঠিক রাখা এসবই সবরের অন্তর্ভুক্ত।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
"যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।"
(সহিহ মুসলিম – ২৬৯৯)
"জ্ঞান অর্জন ধৈর্য ছাড়া সম্ভব নয়; যে ধৈর্য হারায়, সে জ্ঞানের স্বাদ পায় না।"(তালিমুল মুতাআল্লিম)
আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ

অর্থ: "যে তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোর ভয় রাখে এবং নিজের প্রবৃত্তিকে সংযত রাখে।" (সূরা আন-নাজিয়াত–৪০)

সবর না হলে প্রবৃত্তি মানুষের পথে বাধা সৃষ্টি করে। জ্ঞান অর্জন করতে গিয়ে মন ক্লান্ত হয়, শরীর অবসাদগ্রস্ত হয়, ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হয়ে যায় কিন্তু ধৈর্য সেই ইচ্ছাশক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করে।
"সবর হলো আত্মার লাগাম; এটি মানুষকে ভুল পথে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।"(মাদারিজুস সালেকীন)

শুধু জ্ঞান অর্জন করাই যথেষ্ট নয়; সেই জ্ঞান অনুযায়ী আমল করাই আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু আমল করতে গেলে নফস, অলসতা, পরিবেশ সবই বাধা সৃষ্টি করে। এগুলোর উপর জয়ী হতে ধৈর্য অপরিহার্য।
আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا

অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং দৃঢ়ভাবে অটল থাক।" (সূরা আলে ইমরান–২০০)

সবর তিন প্রকার
১) আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্য

২) গোনাহ থেকে বাঁচতে ধৈর্য
৩) বিপদে ধৈর্য
এবং তিনটিই সঠিক জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হয়।
(মাদারিজুস সালেকীন)
“জ্ঞান বৃক্ষের মতো, আর ধৈর্য তার ফল রক্ষাকারী প্রহরী। ধৈর্য না থাকলে সেই ফল নষ্ট হয়ে যায়।”(ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন)

ইবনু আতা’ইল্লাহ আল-ইস্কন্দরী বলেন,
“যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে, তার জ্ঞান পরিপক্ক হয় এবং সে ভুল থেকে বেঁচে যায়।”
ইলম ও কষ্ট সহ্য করার মানসিকতা
ইলম কখনো নিজে থেকে কারো কাছে চলে আসে না। এর জন্য চেষ্টা করতে হয়, পরিশ্রম করতে হয়, মন ও শরীরের কষ্ট স্বীকার করতে হয়। এজন্য পূর্বসূরি আলিমরা বলেন লমের পথে প্রথম উপহার হলো কষ্ট; আর সেই কষ্ট সহ্য করাই হলো প্রকৃত সবর।
কবি সুন্দরভাবে বলেন,
তুমি মর্যাদার জন্য হামাগুড়ি দিচ্ছো
অথচ যারা মর্যাদার শিখরে উঠেছে,
তারা করেছে প্রবল পরিশ্রম,
পরিশ্রমের তীব্রতায় বাঁধন খুলে গেছে তাদের লুঙ্গির।
তারা মর্যাদা পেতে সংগ্রাম করেছে,
অধিকাংশই ক্লান্ত হয়ে ছিটকে পড়েছে,
কিন্তু যারা স্থির থেকেছে,
যারা ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছে
তারাই শেষ পর্যন্ত মর্যাদার স্বাদ পেয়েছে।
মর্যাদাকে এমন সহজ কোনো খেজুর ভেবো না,
যা চাইলে হাত বাড়িয়েই খেতে পারবে।
মর্যাদার উচ্চ আসনে উঠতে হলে
ধৈর্যের পূর্ণ স্বাদ আস্বাদন করতেই হবে।
ইলম হলো আলো, আর ধৈর্য হলো সেই আলোর জ্বালানি।

ইলম পথ দেখায়, আর ধৈর্য সেই পথে এগিয়ে রাখে।
ইলম মানুষকে উন্নত করে, আর ধৈর্য তাকে পরিপূর্ণ করে। তাই ধৈর্য ছাড়া ইলম অর্জন সম্ভব না। (ব্যস্ততার এই যুগে এর অন্বেষণ)

ইলম ও তাকওয়া:

ইলম বলতে বোঝায় তথ্য, বোঝাপড়া এবং সঠিক উপলব্ধি। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ইলম হলো কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক জ্ঞান যা মানুষকে হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে সচেতন করে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন।
إِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓؤُاْۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٞ
"বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।" (সূরা ফাতির–২৮)
ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন:
"জ্ঞান হলো আলো, আর তাকওয়া হলো সেই আলোর পথনির্দেশনা।" (মাদারিজুস সালেকীন)

তাকওয়ার পথে চলার জন্যে দ্বীনি ইলমের বিকল্প নেই। ইলম ছাড়া তাকওয়া অবলম্বনের চিন্তা নৌকা ছাড়া নদী পার হওয়ার মতো। শরীয়তের হুকুম আহকাম তো জীবনের দু-চারটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃত। তাই আল্লাহর ফরমানদারি ও নাফরমানীর বিষয়ও জীবনজুড়ে বিস্তৃত। তাকওয়ার ক্ষেত্রও তাই গোটা জীবন এবং জীবনের সকল কর্ম। জীবনের সকল কাজে শরীয়তের হুকুম আহকাম জেনে সে অনুযায়ী চলার নামই তাকওয়া।
তাহলে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, তাকওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে শরীয়তের হুকুম আহকামের ইলম। বস্তুত বিশুদ্ধ ইলম হচ্ছে আমাদের দ্বীনি জীবন গঠনের অন্যতম প্রধান নিয়ামক। এছাড়া দ্বীনদারি, তাকওয়া, পরহেযগারী গঠনের কোনোই সুযোগ নেই। একারণে শরীয়তের বিধানেও দ্বীনি ইলম অর্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। দ্বীনি ইলম অর্জনকে

গুরুত্বহীন বা কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করা মারাত্মক ভুল, এটি সকল বিভ্রান্তির একটি চোরা পথ।

এজন্য আমাদের বিজ্ঞ মনীষীগণ সবসময় দ্বীনি ইলম অর্জনে উৎসাহ দিয়েছেন এবং এর জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখার কথা বলেছেন।
আমরা যদি আমাদের জীবনকে তাকওয়ার আলোয় উজ্জ্বল করতে চাই, তাহলে অবশ্যই দ্বীনি ইলম অর্জনে আন্তরিকভাবে প্রয়াসী হতে হবে। ইলম ছাড়া সঠিক দিকনির্দেশনা পাওয়া কঠিন, আর দিকনির্দেশনা ছাড়া আমলও অনেক সময় ভুল পথে চলে যেতে পারে।

ইলম অর্জনের স্বাভাবিক ও নিরাপদ পন্থা হচ্ছে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে অর্জন করা। জীবনের সাধারণ দ্বীনি বিধানসমূহ এবং প্রত্যেকের নিজ নিজ পেশা ও কর্মের প্রয়োজনীয় বিধি বিধান ভালোভাবে জেনে নেওয়া কর্তব্য।
কিছু বিষয় অল্প সময়ে শেখা যায়, আবার কিছু বিষয় সময় নিয়ে ধীরে ধীরে রপ্ত করতে হয়। তাই দ্বীনি ইলম অর্জনের জন্য শুধু মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া যথেষ্ট নয়। বরং উলামায়ে কেরামের সঙ্গে থাকা, তাঁদের কাছ থেকে বুঝে শেখা, নিয়মিত শোনা ও অনুশীলন করা প্রয়োজন।

সঙ্গ ও সাহচর্যের মাধ্যমে মানুষের রুচি, চিন্তা ও চরিত্র গঠিত হয়। এজন্য ভালো পরিবেশ ও ভালো সঙ্গ দ্বীনী জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাদীস শরীফে সৎ সঙ্গের গুরুত্ব এবং খারাপ সঙ্গ থেকে সতর্ক থাকার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ভালো সঙ্গ মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়, আর খারাপ সঙ্গ ধীরে ধীরে মানুষকে বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিতে পারে।

এজন্য মুত্তাকী, পরহেযগার ও জ্ঞানী উলামায়ে কেরামের সঙ্গ ও সাহচর্য অবলম্বন করা অত্যন্ত কাম্য। (মাসিক আল কাউসার)
সুফিয়ান আস-সাওরি রহিমাহুল্লাহ বলেন,
“ইলম শেখার উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া (আল্লাহভীতি) অর্জন করা। এ কারণেই ইলম ও আলিমের মর্যাদা বেশি এবং তাঁদের জন্য মাপকাঠি অন্যদের চেয়ে আলাদা। কেননা

আলিমগণ আল্লাহ তাআলাকে বেশি ভয় করেন।" (জামিয়ু বায়ানিল ইলম, বর্ণনা নং: ৭৫৫)

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,
সবাই ভালো কথা বলে, কিন্তু সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যার আমল তার ইলমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যার কথা ও কাজ এক নয়, সে আসলে নিজেকেই তিরস্কার করছে।
আল-কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহ এর সূত্রে ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আমি এমন মানুষ দেখেছি যারা কথার চেয়ে আমলের বেশি মূল্য দিতেন। এর মূল শিক্ষা হলো ইলম কেবল জানার জন্য নয়, বরং তা আমলে বাস্তবায়নের জন্য।

ইলম ও তাকওয়া হলো ইসলামী জীবনব্যবস্থার দুটি অপরিহার্য স্তম্ভ। ইলম মানুষকে পথ দেখায়, আর তাকওয়া সেই পথে দৃঢ়ভাবে স্থির রাখে। শুধুমাত্র জ্ঞান মানুষকে পূর্ণাঙ্গ মুসলমান বানায় না; বরং সেই জ্ঞানের সাথে আল্লাহভীতি যুক্ত হলে তবেই তা পূর্ণতা লাভ করে এবং মানুষের জীবন প্রকৃত অর্থে আলোকিত হয়।

জ্ঞানহীনতার ক্ষতি:

দ্বীন বিষয়ে যথার্থ পড়াশুনা না করা বা না জানা, ধর্মের আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা, সঠিক আরবী ভাষাজ্ঞান না থাকা প্রভৃতি। এসব বিষয়ে সঠিক জ্ঞান না থাকলে অবশ্যই মানুষ বিদআত ও ভ্রষ্টতায় পড়তে বাধ্য। যেমন পথ না চিনলে অবশ্যই মানুষ ভ্রান্ত পথে বিপথগামী হতে বাধ্য হয়।

শরীয়ত মুসলিমকে জ্ঞান শিক্ষার উপর ফরযরূপে উদ্বুদ্ধ করে। অজান্তে কোন কথা আন্দাজে বলতে সাবধান করে। কারণ দ্বীনের ব্যাপারে অনুমানভিত্তিক কথা বলা গুরুতর গুনাহের কারণ হতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন—
قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
অর্থাৎ, বল, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ (হারাম) করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, পাপাচার, অন্যায় সীমালঙ্ঘন, আল্লাহর সাথে শরীক করা যার কোন দলীল তিনি অবতীর্ণ

করেননি এবং আল্লাহর উপর এমন কিছু বলা যে সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই। (সূরা আরাফ – ৩৩)

তিনি আরো বলেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় এগুলোর প্রত্যেকটির বিষয়ে কৈফিয়ত তলব করা হবে। (সূরা ইসরা – ৩৬)

আল্লাহর রাসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

“আল্লাহ বান্দাদের নিকট থেকে ইলম ছিনিয়ে নেওয়ার মত তুলে নেবেন না। বরং উলামা তুলে নিয়ে ইলম তুলে নেবেন। এমতাবস্থায় যখন কোন আলেম অবশিষ্ট রাখবেন না, তখন মানুষ অজ্ঞদেরকে নেতা বানাবে। ফলে তারা জিজ্ঞাসিত হলে বিনা ইলমে ফতোয়া দেবে, এতে তারা নিজেরাও ভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরও ভ্রষ্ট করবে।”

(বুখারী ও মুসলিম, ২৬৭৩ নং)

তিনি আরো বলেন, “আমার পূর্বে কোন উম্মতের মাঝে আল্লাহ যে কোন নবী পাঠিয়েছেন তাঁর জন্যই সহচর ও অনুসারী ছিল, যারা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করত। অতঃপর তাদের পর এমন উত্তরসূরিদের জন্ম হয় যারা যা করে না তা বলে এবং যা করতে আদিষ্ট নয় তা করে। সুতরাং যে ব্যক্তি এমনদের বিরুদ্ধে নিজ হাত দ্বারা জিহাদ করে সে মুমিন, যে জিহ্বা দ্বারা করে সে মুমিন, আর যে অন্তর দ্বারা করে সে মুমিন। এর নিচে সরিষা দানা পরিমাণও ঈমান নেই।”(মুসলিম)

ইলমের গুরুত্ব ও জাহেলিয়াতের ক্ষতি

সুতরাং জ্ঞান এমন আলোকবর্তিকা যার দ্বারা মুসলিম আখেরাতের পথ সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায় এবং হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায় তার সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়। ফলে সে নিজে ভ্রষ্ট হয় না এবং অন্যকেও ভ্রষ্ট করে না।

পক্ষান্তরে জাহেল ব্যক্তি অন্ধের মতো। সে নিজেই পথ চিনে না, অন্যকেও পথ দেখাতে পারে না। ফলে অজ্ঞতা থেকে বিদআত, ভুল ফতোয়া এবং ভিত্তিহীন আমল সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

অনেকেই কেবল গল্প কাহিনী, স্বপ্ন বা আবেগের উপর ভিত্তি করে দ্বীনের কাজ করে। তারা ইলম ও উলামার গুরুত্বকে হালকা মনে করে। অথচ বাস্তবতা হলো এরা নিজের অজান্তেই নিজেদের ও সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

একটি ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়া যায়।

হযরত জাবির রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,

এক সফরে এক ব্যক্তির মাথায় আঘাত ছিল। পরে তার স্বপ্নদোষ হলে সে সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করল, তার জন্য তায়াম্মুমের অনুমতি আছে কি না। তারা বলল, "না, পানি ব্যবহার করতে হবে।" ফলে সে গোসল করল এবং ক্ষতস্থানে পানি লাগার কারণে সে মারা গেল।

নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ঘটনা শুনে বললেন,

"তারা তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন! যদি তারা না জানত তবে কেন জিজ্ঞেস করেনি? অজ্ঞতার চিকিৎসা হলো প্রশ্ন করা।"

(আবু দাউদ, ইবন মাজাহ, মুসনাদ আহমাদ ১/৩৩০)

এই হাদীস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, অজ্ঞতার সাথে ফতোয়া দেওয়া বা না জেনে সিদ্ধান্ত নেওয়া কত বড় বিপদ সৃষ্টি করতে পারে।

বিদআত ও ভুল নেতৃত্বের পরিণতি

অনেক সমাজে দেখা যায়, কিছু অজ্ঞ ব্যক্তি কিতাব ও সুন্নাহর আলেমদের অবমূল্যায়ন করে নিজেদের মতবাদ চালু করে। তারা কল্পিত "গুপ্ত জ্ঞান" বা ভিত্তিহীন ধারণাকে প্রকৃত ইলম মনে করে। ফলে সমাজ ধীরে ধীরে বিভ্রান্তির গভীরে ডুবে যায়।

এরা মানুষের দুনিয়ার পাশাপাশি আখেরাতকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। কারণ তারা দ্বীনের নাম ব্যবহার করলেও প্রকৃত জ্ঞানের আলো থেকে দূরে থাকে।

ইলম ছাড়া আমল অসম্পূর্ণ। আবার অনেকে মনে করে শুধু আমল করাই যথেষ্ট, ইলমের প্রয়োজন নেই। এটি একটি বড় ভুল ধারণা। কারণ ইলম ছাড়া আমল সঠিকভাবে হয় না।

ইলম হলো ঈমানের আলো এবং শয়তানের বিরুদ্ধে অস্ত্র। যে ব্যক্তি এই অস্ত্র থেকে দূরে থাকে, শয়তান তাকে সহজেই বিভ্রান্ত করতে পারে। ফলে তার আমল বিদআতে রূপ নিতে পারে।

সমাজের বাস্তব অবস্থা ও সতর্কতা

অনেক সমাজে দেখা যায়, অল্প পড়াশোনা করেই কেউ নিজেকে "মাওলানা" বা "ফতোয়াদাতা" বানিয়ে ফেলে। কেউ আবার বিভিন্ন ছোট বই বা গল্পের উপর ভিত্তি করে বড় বড় সিদ্ধান্ত দেয়। ফলে প্রকৃত আলেমদের কথা উপেক্ষিত হয়।

যখন কোনো প্রকৃত আলেম কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী সঠিক দিক নির্দেশনা দেন, তখন অজ্ঞরা নিজেদের অবস্থান হারানোর ভয়ে তাকে বিরোধিতা করে, এমনকি ভুল ব্যাখ্যা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে।

ফলে সমাজে বিদআত বৃদ্ধি পায় এবং সত্য জ্ঞানের আলো ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে।

অতএব ইলম হলো এমন এক আলো, যা মানুষের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা দান করে। ইলম ছাড়া মানুষ অন্ধের মতো পথ চলে, আর অন্ধের পক্ষে অন্যকে পথ দেখানো সম্ভব নয়। (হাদিস বাংলা)

৫) ইলম অর্জনের ফজিলত (বিশেষ টপিক)

ইলম অর্জনকারী বা তালিবুল ইলমের মর্যাদা:

ইলমের ময়দানে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, তালিবে ইলম নিজেই নিজের মর্যাদা সম্পর্কে জানে না এবং তালিবে ইলমের সমাজও তা জানে না। তালিবে ইলমের সমাজ তাকে অমর্যাদার চরমে নিয়ে গেছে। তালিবে ইলমের চোখেও নিজের মর্যাদা নেই, তার সমাজের চোখেও মর্যাদা নেই।

তালিবে ইলম নিজেও তার শিক্ষককে সম্মান করে না। সমাজও মাদরাসার দ্বীনের শিক্ষককে যথাযথ মর্যাদা দেয় না। অথচ বাস্তবতা হলো, ইলমে দ্বীনের শিক্ষকরা নবীদের উত্তরসূরি তাদের মর্যাদা কোনো দুনিয়াবী পেশার সাথে তুলনীয় নয়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের যে সামাজিক মর্যাদা, একজন দ্বীনি মাদরাসার শিক্ষকের সে মর্যাদা নেই। একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের যে সামাজিক অবস্থান, একজন তালিবে ইলমের সে অবস্থান নেই।

এটা পদে পদে আমরা দেখতে পাই। সমাজের চোখে একটি স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মর্যাদা, একটি দ্বীনি মাদরাসার সে মর্যাদা নেই। কার চোখে নেই? শুধু সমাজের চোখেই নয়, অনেক সময় মাদরাসায় যারা বসবাস করছে, তাদের চোখেও নেই। তারাও পদে পদে মাদরাসাকে অসম্মান করে, মাদরাসার শিক্ষককে অসম্মান করে, ইলমকে অসম্মান করে। ফলে ইলমের মর্যাদা বাহ্যিকভাবে ও অন্তর্দৃষ্টিতেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আর সমাজও তাই। এটাই হলো এখন ইলমের সবচেয়ে বড় মর্মান্তিক সমস্যা। যতদিন পর্যন্ত আমরা এই মর্যাদাকে পুনরুদ্ধার করতে না পারব, ততদিন পর্যন্ত আমাদের কোনো শক্তিশালী ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠা কঠিন।

নিজের মর্যাদা উপলব্ধি করা জরুরি প্রথমে নিজের চোখেই নিজেকে মর্যাদা অর্জন করতে হবে। আমি যেন নিজেকে সম্মান করি, নিজের শিক্ষককে সম্মান করি, আমি

যেন মাদরাসাকে সম্মান করি এবং ইলমের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়কে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখি।

যখন আমি নিজেকে সম্মান করতে শিখব, তখন ধীরে ধীরে আমার চারপাশের লোক আমাকে সম্মান করবে। কারণ মানুষ সাধারণত সেই ব্যক্তিকেই মূল্য দেয়, যে নিজে নিজের মূল্য বোঝে।

সবচেয়ে বড় সমস্যা এবং মর্মান্তিক বাস্তবতা হলো আজ অনেক তালিবে ইলমের চোখে নিজের মর্যাদা নেই, আবার সমাজের চোখেও নেই। এই দ্বিমুখী অবমূল্যায়নই ইলমের পরিবেশকে দুর্বল করে দিচ্ছে। এটাকে পুনরুদ্ধার করতে হবে।
নিজের চোখে নিজের মর্যাদা ফিরিয়ে আনা এবং সমাজের চোখেও নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের চিন্তা করে বুঝতে হবে, কোন আচরণে মর্যাদা রক্ষা পায় এবং কোন আচরণে মর্যাদা নষ্ট হয়।

পারিবারিক বাস্তবতা ও দ্বীনি শিক্ষার অবমূল্যায়ন
আমাদের দেশে দুঃখজনকভাবে এক পরিবারে একাধিক ধরনের শিক্ষার প্রচলন আছে। অনেক সময় দেখা যায়, পরিবারের অধিকাংশ ছেলে-মেয়ে স্কুল-কলেজে পড়ে, আর একজন পড়ে মাদরাসায়।

যে মাদরাসায় পড়ে, সে নিজেকে ছোট মনে করে আর অন্যরাও তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। কেউ করুণার চোখে দেখে, কেউ আবার বলে“এটা বেকার!” আবার কেউ করুণা করে বলে“চিন্তা করিস না, তোর জন্য আলাদা ব্যবস্থা করে রাখব।”

এভাবে দ্বীনী শিক্ষাকে দয়া-দাক্ষিণ্য বা করুণার বিষয় বানিয়ে ফেলা হয়। অথচ এটি দয়া নয়, বরং এক ধরনের অজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। কারণ দ্বীনী ইলম কোনো অবহেলার বিষয় নয়, বরং এটি সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।

অনেক বাবা-মা মনে করে, দুনিয়ার প্রতিষ্ঠার জন্য এক সন্তানকে পড়ালেখা করাই যথেষ্ট, আর অন্যজনকে মাদরাসায় দিয়ে দেওয়া যায় যেন সে “পরকালের দায়িত্ব”

বহন করবে। অথচ ইসলাম এমন বিভাজনকে সমর্থন করে না; বরং উভয় দিকেই ভারসাম্যপূর্ণ জ্ঞান ও সম্মান থাকা প্রয়োজন।

তালিবে ইলমের আত্মমর্যাদা

তালিবে ইলমের জন্য সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো নিজের মর্যাদা নিজের চোখে প্রতিষ্ঠা করা। সে যেন মনে করে আমি এই পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একজন, কারণ আমি আল্লাহর দ্বীনের পথে ইলম অর্জন করছি।

তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বুঝতে হবে নিজের মর্যাদা উপলব্ধি করা আর অহংকার করা এক জিনিস নয়। মর্যাদা মানে দায়িত্ব ও অবস্থানের গুরুত্ব বোঝা, আর অহংকার মানে অন্যকে ছোট করা। বাস্তব জীবনে মর্যাদা রক্ষা

এখন মর্যাদা দুই ধরনের একটি নিজের চোখে মর্যাদা, আরেকটি সমাজের কাছে মর্যাদা দাবি করা। সমাজের কাছে মর্যাদা জোর করে দাবি করলে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়, তাই সেটা উদ্দেশ্য নয়।

কিন্তু নিজের চোখে মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। অর্থাৎ আমি এমন কোনো কাজ করব না, যা আমার দ্বীনি পরিচয়ের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। একজন তালিবে ইলম হিসেবে আমার আচরণ, চরিত্র ও সিদ্ধান্ত আলাদা হতে হবে।

যেমন একজন কলেজ বা স্কুল ছাত্র যা করতে পারে, আমি তা করতে পারি না; কারণ আমার উপর ইলমের দায়িত্ব আছে। আমার প্রতিটি আচরণে দ্বীনের সম্মান রক্ষা পেতে হবে।

আল্লাহর বিধান মেনে চলাই মর্যাদা

আমি নিজের মর্যাদা তখনই প্রতিষ্ঠা করব, যখন আমি আল্লাহর আদেশগুলো দৃঢ়ভাবে পালন করব এবং নিষেধগুলো থেকে দৃঢ়ভাবে বেঁচে থাকব।

পরিবার বা সমাজ যদি এমন কোনো কাজে যুক্ত করতে চায় যা দ্বীনের বিপরীত, তখন আমি বিনয়ের সাথে দৃঢ়ভাবে বলব আমি এতে অংশ নিতে পারব না।

যেমন কোনো হারাম বা সন্দেহজনক বিবাহ, অনুষ্ঠান বা পরিবেশে আমাকে যুক্ত করতে চাইলে আমি ভদ্রভাবে প্রত্যাখ্যান করব। এটি অভদ্রতা নয়, বরং ঈমানের দাবি।

তালিবে ইলমের মর্যাদা ও দুআর বিষয়
যদি কোনো তালিবে ইলম সত্যিকারভাবে নিজের মর্যাদা রক্ষা করে, আল্লাহর আদেশ মেনে চলে এবং পাপ থেকে বেঁচে থাকে, তাহলে তার জন্য বিশেষ রহমত রয়েছে।

হাদীসে এসেছে, আলেম ও তালিবে ইলমদের জন্য আসমান জমিনের সৃষ্টিকূল দুআ করে এটি তখনই প্রযোজ্য, যখন সে নিজের অবস্থান ও মর্যাদা বুঝে চলার চেষ্টা করে।

পরিবারের মধ্যে যদি কেউ দ্বীনের বিপরীত কোনো কাজে যুক্ত করতে চায়, তাহলে তালিবে ইলমকে নমনীয়তা ও দৃঢ়তার ভারসাম্য রাখতে হবে। অভদ্রতা করা যাবে না, রুক্ষতা করা যাবে না, কিন্তু নিজের অবস্থানে অটল থাকতে হবে।
যেমন ঘরে টেলিভিশন বা অনৈতিক পরিবেশ থাকলে, সেখানে শালীনভাবে দূরে থাকা উচিত। ভদ্রতা বজায় রেখে নিজের আদর্শ রক্ষা করাই প্রকৃত দ্বীনদারি।

অতএব মূল সমস্যা হলো ইলমের মর্যাদা সমাজ ও নিজের চোখে হারিয়ে যাওয়া। যতদিন তালিবে ইলম নিজেকে মর্যাদাবান মনে না করবে, শিক্ষককে সম্মান না করবে এবং ইলমকে জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে না আনবে, ততদিন পর্যন্ত এই সংকট দূর হবে না।
ইলম শুধু পড়ার বিষয় নয়, এটি একটি মর্যাদা, একটি দায়িত্ব এবং একটি আলোকিত জীবনব্যবস্থা। (মাসিক আল কাউসার)

আলেমদের মর্যাদা:

দ্বীন সম্পর্কে বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ হলেন আলেম। যারা দ্বীনের সংরক্ষণ, দ্বীনী ইলম বিতরণ ও প্রচার প্রসারের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। ফলে ইহকালে যেমন তারা নন্দিত ও সম্মানিত হন, তেমনি পরকালে জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যমে চিরস্থায়ী মর্যাদা ও সফলতা লাভে ধন্য হবেন।

পৃথিবীর সকল মানুষকে কখনও না কখনও আলেমের মুখাপেক্ষী হতে হয়। আমল বাস্তবায়নের জন্য আলেমদের থেকে জ্ঞান লাভ করা জরুরী। কারণ শরীয়তের বিধান সঠিকভাবে বুঝা ও পালন করা ইলম ছাড়া সম্ভব নয়। তাইতো মহান আল্লাহ বলেন,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

'যদি তোমরা না জানো, তাহলে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর।'(সূরা নাহল –৪৩)

আলেমদের মর্যাদা আল্লাহর দৃষ্টিতে

আল্লাহ দ্বীনি ইলমের অধিকারীকে দুনিয়া ও আখেরাতে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নীত করবেন।'(সূরা মুজাদালা – ১১)

প্রকৃত আলেম তারা, যারা কুরআন ও সহীহ হাদীসের জ্ঞানে সুদক্ষ এবং সেই জ্ঞান অনুযায়ী আমলকারী।

আলেম ও আবেদের মর্যাদার পার্থক্য

ইসলামে ইবাদতকারী (আবিদ) অপেক্ষা আলেমের মর্যাদা অনেক বেশি। কারণ আলেম শুধু নিজের ইবাদতই করে না, বরং অন্যকেও ইবাদতের সঠিক পথ দেখায়।

আবূ উমামাহ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ

'আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর তদ্রূপ, যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের মধ্যে সাধারণ ব্যক্তির উপর। আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, আসমান-যমীনের সকল সৃষ্টিজীব এমনকি পিঁপড়া ও মাছ পর্যন্ত মানুষের শিক্ষকদের জন্য দো'আ করে।' (তিরমিযী – ২৬৮৫)

এ থেকে বোঝা যায়, ইলম শিক্ষা ও শিক্ষা দান শুধু ব্যক্তিগত ইবাদত নয়; বরং একটি সার্বজনীন রহমতের কারণ।

আলেমদের জন্য সৃষ্টিজগতের দো'আ

আবূ দারদা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লালাহু আলাই ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি,

وَإِنَّ العَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ...ِ

'নিশ্চয়ই আলেম ব্যক্তির জন্য আকাশ-যমীনের সকল সৃষ্টিজীব এমনকি পানির মাছ পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে।'

(আবূ দাঊদ – ৩৬৪৩, তিরমিযী – ২৬৮২)

এটি আলেমের মর্যাদার এক বিশাল প্রমাণ—যে ব্যক্তি মানুষের হিদায়াতের মাধ্যম, তার জন্য সমগ্র সৃষ্টি দো'আ করে।

আল্লাহভীতির মূল ভিত্তি ইলম

আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করাই তাঁর ভয় অর্জনের মূল ভিত্তি। তাই যারা বেশি জানে, তারা আল্লাহকে বেশি ভয় করে।

রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"আল্লাহ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানে যারা, তারাই তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে।"(বুখারী– ৪৬২১)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ ُ

'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমরাই আল্লাহকে ভয় করে।'(সূরা ফাতির – ২৮)

অর্থাৎ জ্ঞান যত গভীর হবে, আল্লাহভীতিও তত বৃদ্ধি পাবে।

ইমামতির ক্ষেত্রে আলেমদের অগ্রাধিকার

ইমামতি ইসলামে একটি সম্মানজনক দায়িত্ব। রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে ইমাম বানাতেন।

রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি বলেন,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ...ِ

'লোকদের ইমামতি করবে সে, যে কুরআন তেলাওয়াতে সবচেয়ে পারদর্শী; যদি সবাই সমান হয়, তাহলে যে সুন্নাহ সম্পর্কে বেশি জ্ঞানী।'(মুসলিম – ৬৭৩)

এ থেকে স্পষ্ট যে নেতৃত্বের মূল ভিত্তি হলো ইলম।

আলেম ও জাহেলের মধ্যে পার্থক্য

আলেম ও অজ্ঞ কখনো সমান হতে পারে না।

আল্লাহ বলেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

‘বল, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান?’(সূরা যুমার – ৯)

আরো বলেন,

কুরআনের দৃষ্টান্ত বোঝার যোগ্যতা আলেমদের

আল্লাহ বলেন,

وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

‘এ দৃষ্টান্তগুলো কেবল জ্ঞানীরাই অনুধাবন করে।’(সূরা আনকাবূত – ৪৩)

অর্থাৎ কুরআনের গভীর শিক্ষা বুঝতে ইলম অপরিহার্য।

ফিতনার যুগ ও আলেমের অভাব

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন সমাজে ফিতনা বৃদ্ধি পাবে তখন

আমানতদার কমে যাবে,ফকীহ ও আলেম কমে যাবে, ক্বারী বেশি হবে কিন্তু ইলম থাকবে না,দুনিয়ার উদ্দেশ্যে দ্বীন শেখা হবে। (ইবনে আবী শায়বা – ৩৭১৫৬; সহীহুত তারগীব – ১১১)

এটি বর্তমান সময়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা।

ইলম বিলুপ্তির ভয়াবহতা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعا...

‘আল্লাহ ইলম সরাসরি উঠিয়ে নেন না; বরং আলেমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেন।’ (বুখারী – ৭৩০৭, মুসলিম – ৬৯৭২)

অর্থাৎ আলেম কমে গেলে সমাজে জাহেলদের নেতৃত্ব শুরু হয়, ফলে ভ্রষ্টতা ছড়িয়ে পড়ে।

আলেমদের সংরক্ষণে খলীফার উদ্যোগ

উমর ইবনু আব্দুল আযীয রহিমাহুল্লাহ বলেন,

انظر ما كان من حديث رسول الله فَاكْتُبُوه...ُ

‘রাসূল আল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কর, কারণ আমি ইলম বিলুপ্তির আশঙ্কা করি।’(ফাতহুল বারী – ১/১৪০)

এটি প্রমাণ করে, ইলম সংরক্ষণ ইসলামী রাষ্ট্রনীতির অংশ ছিল।

অতএব আলেমরা শুধু ধর্মীয় ব্যক্তি নন; বরং তারা মানবতার পথপ্রদর্শক, সমাজের আলোকবর্তিকা এবং আখেরাতের সফলতার মাধ্যম।

যেখানে আলেমদের মর্যাদা থাকে, সেখানে সমাজ আলোকিত হয়। আর যেখানে আলেমদের অবমূল্যায়ন করা হয়, সেখানে অজ্ঞতা, বিভ্রান্তি ও ফিতনা বৃদ্ধি পায়। (মাসিক আত তাহরিক)

ফেরেশতাদের দোয়া ও জ্ঞানী ব্যক্তির সম্মান:

ফেরেশতাদের দোয়া ও জ্ঞানী ব্যক্তির সম্মান

ইসলামে ইলম বা জ্ঞান অর্জন শুধু দুনিয়াবি প্রয়োজন নয়, বরং এটি একটি ইবাদত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। কুরআন ও সুন্নাহতে আলেমদের উচ্চ মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে এবং ফেরেশতারা তাদের জন্য দোয়া ও রহমত প্রার্থনা করেন।

জ্ঞান অর্জনের মজলিস এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য ফেরেশতাদের দোয়া ও বিশেষ সম্মানের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলাম ইলম অর্জনকে এতটাই গুরুত্ব দিয়েছে যে, এটি শুধু ব্যক্তিগত উন্নতি নয়, বরং পুরো সমাজকে অজ্ঞতা থেকে আলোকিত করার মাধ্যম।

জ্ঞান অর্জনের মজলিসে ফেরেশতাদের উপস্থিতি

দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের মজলিসে রহমতের ফেরেশতারা অংশগ্রহণ করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের ঘিরে রাখেন। ফেরেশতারা শুধু উপস্থিতই থাকেন না, বরং জ্ঞান অন্বেষণকারী ও জ্ঞানীদের জন্য মাগফিরাত ক্ষমা ও রহমতের দোয়া করেন।

ইলম বা দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর বাণী ও রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি এর বাণী জানা যায়, যা মানুষকে মূর্খতা, বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি দেয় এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়তা করে।

যারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করেন এবং আল্লাহর রাস্তায় মেহনত করেন, তাদের জন্য আরশ বহনকারী ফেরেশতারা পর্যন্ত ক্ষমা ও জান্নাতের দোয়া করেন এটি ইলমের মর্যাদার এক বিশাল প্রমাণ। (মাসিক আল কাউসার)

কুরআন তিলাওয়াত ও ইলমের মজলিসে বরকত
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন
“যখন কিছু মানুষ আল্লাহর ঘরে একত্রিত হয়ে কুরআন তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন করে, তখন তাদের উপর শান্তি নেমে আসে, রহমত ঢেকে দেয়, ফেরেশতারা তাদের ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তাদেরকে স্মরণ করেন।”(সহিহ মুসলিম – ২৬৯৯)
এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, ইলমের মজলিস শুধু শিক্ষা নয়; বরং তা আধ্যাত্মিক প্রশান্তি, রহমত ও আল্লাহর বিশেষ স্মরণের স্থান।
ইলম অন্বেষণের পথে জান্নাতের সহজতা
হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম কে বলতে শুনেছেন,

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো পথে বের হয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। নিশ্চয়ই ফেরেশতারা ইলম অন্বেষণকারীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদের পাখা বিছিয়ে দেয় এবং আসমান ও জমিনের সবকিছু এমনকি পানির মাছও তার জন্য ইস্তেগফার ক্ষমা প্রার্থনা করে।"(সুনানে আবু দাউদ –৩৬৪১, জামে তিরমিযী – ২৬৮২)

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, ইলম অন্বেষণ শুধু একটি চেষ্টা নয়; বরং এটি জান্নাতের পথে একটি সরাসরি মাধ্যম।

ইলমের জন্য সৃষ্টিজগতের দোয়া
ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞান অর্জনকারীর মর্যাদা এতটাই উচ্চ যে, শুধু মানুষ নয়, বরং আসমান-যমীনের সমস্ত সৃষ্টিজীব তার জন্য দোয়া করে।

ফেরেশতারা তাদের পাখা বিছিয়ে দেন, সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত ইস্তিগফার করে এটি ইলমের প্রতি আল্লাহর বিশেষ সম্মানের বহিঃপ্রকাশ।
এখানে একটি গভীর শিক্ষা রয়েছে যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের জন্য সময় ব্যয় করে, আল্লাহ পুরো সৃষ্টিজগতকে তার সহায়তায় নিয়োজিত করে দেন।

ইলম অর্জনের আধ্যাত্মিক প্রভাব
ইলম শুধু তথ্য অর্জন নয়; বরং এটি অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে, ঈমানকে শক্তিশালী করে এবং চরিত্রকে সুন্দর করে। একজন সত্যিকারের তালিবে ইলমের মধ্যে দেখা যায় বিনয় ও নম্রতা, বৃদ্ধি পায়, আল্লাহভীতি বৃদ্ধি পায়, হারাম থেকে দূরে থাকার শক্তি আসে, সমাজে ন্যায়ের অনুভূতি তৈরি হয়। কারণ ইলম মানুষকে কেবল জানায় না, বরং বদলে দেয়।

আলেমদের জন্য ফেরেশতাদের দোয়া
হাদীসসমূহ থেকে স্পষ্ট যে, আলেম ও তালিবে ইলমদের জন্য ফেরেশতারা বিশেষভাবে দোয়া করেন। এটি এমন এক মর্যাদা, যা অন্য কোনো পেশা বা জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না।
ফেরেশতাদের দোয়া মানে হলো আল্লাহর বিশেষ রহমত ও সন্তুষ্টির ঘোষণা।

আজকের সমাজে অনেক সময় দেখা যায়, ইলম অর্জনকে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়, অথচ দুনিয়াবি শিক্ষাকে বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে ইলম হলো আলোকবর্তিকা, আলেমরা হলো পথপ্রদর্শক জ্ঞানচর্চার মজলিস হলো জান্নাতের বাগান। সুতরাং সমাজে ইলমের মর্যাদা ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত জরুরি।

ইলম অর্জনকারী ব্যক্তি শুধু নিজের জন্যই কল্যাণ বয়ে আনে না; বরং ফেরেশতাদের দোয়া, সৃষ্টিজগতের ইস্তিগফার এবং আল্লাহর বিশেষ রহমতের অধিকারী হয়।

ইলমের পথ হলো জান্নাতের পথ, আর এই পথে চলা মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত করে।

ইলম ও আমলের সমন্বয়:

ইলম ও আমল দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য দু'টি অংশ। এ দু'টি বিষয়ের যথাযথ সমন্বয় ছাড়া মুমিন জীবনের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। অথচ বর্তমানে মুসলমানদের মাঝে ইলম ও আমলের যথার্থ সমন্বয় খুঁজে পাওয়া খুবই দুষ্কর। আমরা অনেকেই ইসলামকে জানি, কিন্তু সেই ইসলামী জ্ঞানের আলোকে জীবনকে গড়তে পারি না। আমরা কুরআন হাদীছ পড়ি, ইসলামী বই অধ্যয়ন করি, আলেমদের বক্তব্য শুনি, জুম'আর খুৎবা শ্রবণ করি, দ্বীনী জ্ঞান চর্চার সাথে কম-বেশী যুক্ত থাকি, কিন্তু অর্জিত জ্ঞানের প্রতিফলন নেই আমাদের দৈনন্দিন আচরণে, ব্যবসা বাণিজ্যে, দাওয়াতের ময়দানে, রাজনীতিতে কিংবা পারিবারিক জীবনে।

আমাদের ইলম যেন বইয়ের পাতায় বন্দী, আর আমল ও ইবাদত যেন কেবল প্রদর্শনী। ফলে দুর্বল হয়ে পড়েছে আমাদের ব্যক্তিত্ব, ভেঙে পড়েছে সামাজিক ভিত্তি, আমরা হারিয়ে ফেলেছি আদর্শিক স্বকীয়তা, খুইয়ে ফেলেছি আধ্যাত্মিক শক্তিমত্তা, আত্মমর্যাদা ও মুসলিম জাতিসত্তা। জ্ঞানের প্রদীপ হাতে থাকলেও আমলে শক্তি না থাকার কারণে আমরা যেন অন্ধকার জগতের এক দিশেহারা পথিক। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ফুটে উঠেছে ঈমানী দুর্বলতার সুস্পষ্ট প্রভাব।

এ অবস্থা কেবল ব্যক্তিগত নয়; বরং সামাজিক ও উম্মাহগত সংকটেও রূপ নিয়েছে। পরিবারে অশান্তি, সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, অর্থনীতিতে দুর্নীতি এবং নেতৃত্বে অযোগ্যতা সবকিছুর পেছনে ইলম ও আমলের বিচ্ছিন্নতা অন্যতম কারণ। আমরা যদি এই অবস্থা থেকে বের হয়ে না আসতে পারি, তবে দুনিয়াবী জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে, আর পরকালের মর্মন্তুদ শাস্তি তো আছেই। তাই জ্ঞান ও আমলের মাঝে সমন্বয় সাধনের নিমিত্তে এর গুরুত্ব ও ফযীলত জানা প্রয়োজন।

আল্লাহভীতি প্রকাশ পায় তখনই, যখন মানুষ তার অর্জিত জ্ঞানের আলোকে আমল সম্পাদন করে। শুধু মুখে তাক্বওয়ার দাবী করা যথেষ্ট নয়; বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, হারাম ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকা, হালালকে আকড়ে ধরা প্রভৃতির মাধ্যমে তাক্বওয়ার স্বরূপ ফুটে ওঠে।

সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও সালাফে সালেহীনের জীবন ছিল ইলম ও আমলের সুন্দর সমন্বয়ে গড়া। ফলে তাঁদের জীবন ছিল তাক্বওয়ায় ভরপুর। ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী ইবনে আবী ত্বালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাক্বওয়ার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل

‘মহান আল্লাহকে ভয় করে চলা, তাঁর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী আমল করা, অল্পে তুষ্ট থাকা এবং মৃত্যুর দিনের জন্য সদা প্রস্তুত থাকার সমন্বিত নাম হ’ল তাক্বওয়া’। (ড. ফজলুর রহমান, আল-মু‘জামুল ওয়াফী)

মাসরূক্ব রহিমাহুল্লাহ বলেন,

بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَخْشَى اللهَ، وَبِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الْجَهْلِ أَنْ يُعْجَبَ بِعِلْمِهِ

‘কোন ব্যক্তির জ্ঞানী হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে আল্লাহ্কে ভয় করবে। আর কোন লোকের মূর্খ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার অর্জিত জ্ঞান নিয়ে গর্ববোধ করবে’। (ইবনু মাজাহ ২২৪)

অর্থাৎ অর্জিত ইলম তখনই মূল্যবান হয় যখন তা আমলে রূপান্তরিত হয়। হৃদয়ে তাক্বওয়ার স্ফূরণ ঘটার কারণ শুধুমাত্র জ্ঞানার্জন করা নয়, বরং সেই অনুযায়ী চলাই মানুষের সফলতার মাপকাঠি।

ফুযাইল ইবনে ইয়ায রহিমাহুল্লাহ বলেন,

رَهْبَةُ العَبْدِ مِنَ اللهِ عَلَى قَدْرِ عِلْمِهِ بِاللهِ، وَزَهَادَتُهُ فِي الدُّنْيَا عَلَى قَدْرِ رَغْبَتِهِ فِي الآخِرَةِ، مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، اسْتَغْنَى عَمَّا لاَ يَعْلَمُ، وَمَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، وَفَّقَهُ اللهُ لِمَا لاَ يَعْلَمُ، وَمَنْ سَاءَ خُلُقَهُ شَانَ دِيْنَهُ، وَحَسَبَهُ، وَمُرُوءتَهُ

‘বান্দা আল্লাহকে যতটুকু জানে, ততটুকুই তাকে ভয় করে। সে আখেরাতের প্রতি যতখানি উন্মুখ থাকে, দুনিয়ার প্রতি সে ততটাই অনাগ্রহী হয়। যে ব্যক্তি ইলম অনুযায়ী আমল করে, অজানা বিষয় থেকে সে অভাবমুক্ত হয়। আর যে ব্যক্তি স্বীয় জ্ঞান অনুযায়ী

আমল করে, আল্লাহ তাকে অজানা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের তাওফীক্ব দান করেন। (ছহীহুত তারগীব – ৬৮)

এখানে স্পষ্ট যে, ইলম শুধু তথ্য নয়; বরং তা অন্তরকে পরিবর্তন করার শক্তি রাখে। যে ইলম আমল উৎপন্ন করে না, তা কেবল বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। কুরআনে বনী ইসরাঈলের উদাহরণ এসেছে,

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا

'যারা তাওরাত বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল, অতঃপর তারা তা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত হ'ল গাধার মত। (সূরা জুমু'আ – ৫)

এই আয়াত আমাদের সতর্ক করে যে, কেবল জ্ঞান অর্জন করাই যথেষ্ট নয়; বরং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করাই মূল উদ্দেশ্য।

সাঈদ ইবনে আববাস রহিমাহুল্লাহ বলেন,

كُنْ عَالِمًا عَامِلًا فَقَدْ عَلِمَ أَقْوَامٌ وَلَمْ يَعْمَلُوا

'তুমি জ্ঞানী হও এবং সে অনুযায়ী আমলকারী হও ইলম ও আমল পরস্পরের সঙ্গী'। (ইবনু আজীবাহ, আল-বাহরুল মাদীদ ১/৩৩৩)

শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ বলেন,

ولا ريب أن العلم هو مفتاح كل خير

'নিঃসন্দেহে সকল কল্যাণের চাবিকাঠি হ'ল ইলম ইলম ছাড়া ঈমান, আমল, জিহাদ কোনটিরই মূল্য নেই...'। (আল-মু'জামুল ওয়াফী)

অতএব ইলম তখনই আলোকিত হয়, যখন তা আমলে প্রতিফলিত হয়। নচেৎ তা মানুষের বিরুদ্ধে দলিল হয়ে দাঁড়ায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَثَلُ عِلْمٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ، كَمَثَلِ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ

যে ইলম অনুযায়ী আমল করা হয় না, সেটা এমন গচ্ছিত সম্পদের মতো। (তুহফাতুল আহওয়াযী)

এ কারণে দেখা যায়, অনেকেই সালাত জানে কিন্তু আদায় করে না, সততা জানে কিন্তু মানে না, হারাম জানে কিন্তু বর্জন করে না। এটি জ্ঞানের অপব্যবহার ছাড়া আর কিছু নয়।

আল্লাহর কাছে আমলের পরিমাণের চেয়ে মান ও কোয়ালিটি গুরুত্বপূর্ণ। নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ

'হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমল করতে থাক'। (ইবনে বায, মাজমূ'উ ফাতাওয়া, ৪/৫৯)

ইলম ও আমলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল হলো ধারাবাহিকতা। ছোট কিন্তু নিয়মিত আমলই অন্তরকে স্থির রাখে এবং ঈমানকে শক্তিশালী করে।

উপকারী জ্ঞান মানুষকে আরও জ্ঞানের দিকে নিয়ে যায়। যেমন কুরআনে এসেছে,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوْا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

যারা আমাদের পথে চেষ্টা করে, আমরা তাদেরকে আমাদের পথসমূহ দেখাবো। (সূরা আনকাবূত ৬৯)

ইলম ও আমল কখনো আলাদা হতে পারে না। ইলম হলো পথের আলো, আর আমল হলো সেই পথে হাঁটা। আলো থাকলেও হাঁটা না থাকলে গন্তব্যে পৌঁছানো যায় না; আবার হাঁটা থাকলেও আলো না থাকলে পথ হারিয়ে যায়। তাই মুমিন জীবনে এই দুইয়ের সমন্বয়ই সফলতার মূল চাবিকাঠি। (মাসিক আত তাহরিক)

৬) ইলম অর্জনের পদ্ধতি ও শিষ্টাচার

ইলম অর্জনের আদব:

ইলম অর্জনের বেশ কিছু আদব রয়েছে, একজন তালিবুল ইলমের সে আদবগুলোতে সুশোভিত হওয়া উচিত। ইলম কেবল তথ্য নয়, বরং এটি অন্তরের প্রশিক্ষণ ও আত্মার পরিশুদ্ধির একটি মাধ্যম। তাই আদব ছাড়া ইল্‌ম অর্জন অনেক সময় উপকারের পরিবর্তে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

১. ধৈর্য

নিঃসন্দেহে ইলম অর্জন উচ্চ মর্যাদার বিষয়। পরিশ্রমের সিঁড়ি না পেরিয়ে উচ্চ শিখরে পৌঁছা যায় না। ইলমের পথে ধৈর্য হলো মূল ভিত্তি, যা ছাড়া অগ্রগতি অসম্ভব।

কবি আবু তাম্মাম নিজেকে সম্বোধন করে বলেন:

ছেড়ে দে আমায়, আমি মর্যাদার শীর্ষে পৌঁছতে চাই, সাধারণত যেথায় পৌঁছা যায় না। কঠিন শিখরে পৌঁছতে হয় কাঠিন্য পার হয়ে, সহজ স্তরে পৌঁছা যায় সহজে। তুমি সস্তা পথে উচ্চ শিখরের নাগাল পেতে চাও? মধু খেতে হলে মধুকরের হুলে বিদ্ধ হতে হয়।

অন্য এক কবি বলেন,

তুমি বৃদ্ধের গতিতে মর্যাদার পানে আগাচ্ছ। অথচ অন্যেরা কষ্টের চূড়ান্তে পৌঁছে লুঙ্গি ফেলে রেখে ছুটে চলছে। মর্যাদার লক্ষ্যপানে কঠিন পরিশ্রম করে তাদের অধিকাংশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মর্যাদার নাগাল তারাই পায় যারা অধ্যাবসায় চালিয়ে যায় ও ধৈর্য রাখে। তুমি মর্যাদায় পৌঁছাকে খেজুর খাওয়ার মত সহজ মনে করো না। বরং তুমি তিতা ঔষুধ চেটে খাওয়া ব্যতীত মর্যাদার সীমানায় পৌঁছতে পারবে না।

বাস্তবেও দেখা যায়, যারা শুরুতে ধৈর্য ধরে অধ্যয়ন চালিয়ে যায়, তারাই পরবর্তীতে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়। আর যারা তাড়াহুড়া করে, তারা মাঝপথেই থেমে যায়।

সুতরাং ধৈর্য ধর, অধ্যবসায়ী হও। কারণ জিহাদের সবর হয় সামান্য কিছু সময়ের জন্য; কিন্তু তালিবুল ইল্মকে জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে হয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক, আর আল্লাহ্ ভীতি অবলম্বন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[সূরা আলে ইমরান – ২০০]

২. কর্মনিষ্ঠা (ইখলাস)

আপনি নিষ্ঠার সাথে কর্ম করুন। আপনার উদ্দেশ্য যেন হয় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও পরকাল, লৌকিকতা ও সঙ্গি-সাথীদের উপরে উঠার লিপ্সা থেকে বেঁচে থাকুন। ইলম অর্জনের মূল ভিত্তি হলো নিয়ত।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করে আলিমদের ওপর গৌরব করার জন্য অথবা জাহিল-মূর্খদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করার জন্য অথবা মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য; আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।"(সুনানে নাসাঈ – ২৬৫৪, আলবানী সহিহুন নাসাঈ গ্রন্থে হাদিসটিকে হাসান বলেছেন)

অতএব ইলম অর্জন যদি ইখলাসবিহীন হয়, তবে তা নেকির পরিবর্তে গুনাহের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

মোটকথা আপনার ভেতর ও বাহির বড়-ছোট সব ধরণের গুনাহ থেকে পবিত্র হতে হবে। ইল্ম অর্জনের আগে অন্তরকে সংশোধন করা জরুরি।

৩. ইল্ম অনুযায়ী আমল করা

জেনে রাখুন, আমল হচ্ছে ইলমের ফলাফল। যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করল কিন্তু আমল করল না সে ব্যক্তি ইহুদীদের মত, আল্লাহ্ কুরআনে যাদের ক্ষেত্রে সর্বনিকৃষ্ট উদাহরণ টেনে এনেছেন। তিনি বলেন,

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا

“যাদেরকে তওরাত দেয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা এর অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা; যে পুস্তক বহন করে ”(সূরা জুমুআ – ৫)

আর যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করে সে খ্রিস্টানদের মত, যারা পথচ্যুত হয়েছে আবেগনির্ভর ইবাদতের কারণে।

অতএব ইলম ও আমল একে অপরের পরিপূরক। একটি ছাড়া অন্যটি অকার্যকর।
আপনার যে কিতাবগুলো প্রয়োজন সেগুলো পাওয়ার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করুন। কেননা কিতাব হচ্ছে ইলম অর্জনের মাধ্যম। তবে কেবল বই সংগ্রহ করাই উদ্দেশ্য নয়, বরং বুঝে অধ্যয়ন ও বাস্তব প্রয়োগই মূল লক্ষ্য।

আজ অনেকেই বইয়ের ভাণ্ডার গড়ে তোলে, কিন্তু তা থেকে জীবন গঠন করে না। এটি প্রকৃত ইলম নয়, বরং তথ্যের সঞ্চয়মাত্র।

৪. সঙ্গি নির্বাচন করা
আপনি একজন নেককার ও ইলম নিয়ে ব্যস্ত থাকে, স্বভাব প্রকৃতি ভাল এমন সঙ্গি গ্রহণে সচেষ্ট হোন। যে বন্ধু আপনাকে আপনার লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করবে।

ভালো সঙ্গী ইলমের পথে অগ্রগতি সহজ করে, আর খারাপ সঙ্গী মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

অসৎ সঙ্গি থেকে দূরে থাকবেন। কেননা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি অন্যের দ্বারা সংগোপনে প্রভাবিত হয়। মানুষ হচ্ছে- পাখির ঝাঁকের মতন; একটা আরেকটাকে অনুকরণ করে থাকে।
অনেক সময় একজন ছাত্রের পতনের পেছনে তার সঙ্গীর প্রভাবই বেশি থাকে, জ্ঞানের অভাব নয়।

৫. উস্তাদের সাথে আদব রক্ষা করা

প্রাথমিক স্তরের ইলম কিতাবের বুক থেকে গ্রহণ করা যায় না। বরঞ্চ অবশ্যই একজন শাইখ থেকে নিতে হয়, যাতে করে পদস্খলন থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

আপনার কর্তব্য হচ্ছে শাইখের সাথে আদব রক্ষা করে চলা। কেননা এটাই হচ্ছে আপনার কল্যাণ, সফলতা এবং ইলম হাছিলের চাবিকাঠি।

উস্তাদের সাথে আদব শুধু বাহ্যিক আচরণ নয়, বরং অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাও এর অন্তর্ভুক্ত।

আপনি শাইখের সাথে যাবতীয় আদব রক্ষা করে চলবেন, তাঁর সাথে বসার ক্ষেত্রে, কথা বলার ক্ষেত্রে, প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে, শ্রবণ করার ক্ষেত্রে, তার সামনে কিতাবের পৃষ্ঠা উল্টানোর ক্ষেত্রে

এছাড়াও প্রয়োজনের বেশি প্রশ্ন করা, তর্ক করা বা অবজ্ঞাসূচক আচরণ থেকে বিরত থাকবেন।

উস্তাদের ভুল দেখা গেলেও তার মর্যাদা কমিয়ে দেখা উচিত নয়; বরং দোয়া ও সংশোধনের দৃষ্টিভঙ্গি রাখা উচিত।

কারণ জ্ঞানহীনতা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব, কিন্তু অহংকার থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন। আল্লাহ্ বলেন,

تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ

“আর আপনি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন” (সূরা আলে –২৬)

ইলম অর্জনের অন্যতম বড় আদব হলো সময়কে গুরুত্ব দেওয়া। সময় নষ্ট করলে ইলমও নষ্ট হয়। সালাফে সালেহীন এক মুহূর্তও অযথা নষ্ট করতেন না। যা শিখা হয় তা বারবার চর্চা না করলে ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই মুতালাআ ও রিভিশন ইলমের অংশ। ইলম যত বাড়ে, ততই বিনয় বাড়া উচিত। অহংকার ইলমের বরকত নষ্ট করে দেয়।

ইলম অর্জন একটি পবিত্র সফর। এই সফরে ধৈর্য, ইখলাস, আমল, সঙ্গী নির্বাচন এবং উস্তাদের আদব সবকিছুই অপরিহার্য। এগুলো ছাড়া ইল্‌ম কেবল তথ্য থেকে যায়, যা মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করার পরিবর্তে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। (ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ)

ইলম অর্জনের নিয়ত:

একজন তালেবে ইলমের জন্য শিক্ষাকালে নিয়ত করা অত্যাবশ্যক। কারণ, সর্বাবস্থায় নিয়তই মূল বিষয়। কেননা, রাসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই কর্মসমূহের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। এই হাদিসটি সনদের দিক থেকে সহিহ।

রাসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একথা বর্ণিত হয়েছে যে, অনেক কাজ দুনিয়াবী কাজের আকৃতি ধারণ করে। কিন্তু নিয়ত ঠিক থাকার কারণে তা আখেরাতের কাজে পরিণত হয়ে যায়। আবার এমনও অনেক কাজ রয়েছে, যা আখেরাতের কাজের আকৃতি ধারণ করে। কিন্তু নিয়ত ঠিক না থাকার কারণে তা দুনিয়ার কাজে পরিণত হয়।

শিক্ষার্থীদের জন্য করণীয় হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি, আখেরাতের কল্যাণ লাভ, নিজের ও অন্য সকল মূর্খদের অজ্ঞতা দূর করা, দ্বীন ইসলামের প্রতিষ্ঠা এবং একে টিকিয়ে রাখাকে ইলম অর্জনের লক্ষ্য হিসেবে সাব্যস্ত করা। কারণ, ইলমের উপরই নির্ভর করে ইসলামের টিকে থাকা। আর অজ্ঞতা দ্বারা দুনিয়া বিমুখতা ও পরহেজগারীর সঠিকত্ব লাভ করতে পারে না।

আমার ওস্তাদ হিদায়া প্রণেতা শায়খ বুরহানুদ্দীন এক আলেমের এ কবিতাটি আমাকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন,

১. সীমালংঘনকারী আলেম বড় ফাসাদ সৃষ্টিকারী। আর তার চেয়েও বড় ফাসাদ সৃষ্টিকারী হচ্ছে মূর্খ ধার্মিক।

২. দুনিয়াতে তারা উভয়ই ঐ লোকের জন্য মহা ফিতনা, যে তার ধর্মীয় বিষয়ে তাদের অনুসরণ করে।

এই কবিতার মাধ্যমে বোঝা যায়,জ্ঞান ছাড়া দ্বীন পালন যেমন বিপজ্জনক, তেমনি আমল ছাড়া জ্ঞানও পথভ্রষ্টতার কারণ হতে পারে।

নিয়তের বিশুদ্ধতা ও উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থী ইলম অর্জনের বেলায় বুদ্ধি এবং শারীরিক সুস্থতার শোকর আদায়ের নিয়তও করবে। নিজের কাছের লোকজনের আগমন, দুনিয়া লাভ ও রাজা বাদশাহর নিকট সম্মান প্রাপ্তি ইত্যাদির উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করবে না।

বরং উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং পরকালে মুক্তি।

ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান রহিমাহুউল্লাহ বলেছেন, দুনিয়ার সকল মানুষ যদি আমার গোলাম হয়ে যেত, তবে আমি অবশ্যই তাদের সকলকে মুক্ত করে দিতাম এবং তাদের প্রভূত্ব থেকে নিজেও মুক্ত হয়ে যেতাম। এটা এ কারণে, যে ব্যক্তি ইলম ও সে অনুযায়ী আমল করার স্বাদ পেয়েছে, সে খুব কমই মানুষের সম্পদের প্রতি লোভ করে।

অর্থাৎ প্রকৃত ইলম মানুষকে দুনিয়ার লোভ থেকে মুক্ত করে।

আমাকে আমার ওস্তাদ মহান ইমাম কিওয়ামুদ্দীন হাম্মাদ বিন ইব্রাহিম বিন ইসমাইল আল সাফফার আল আনসারী ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ এর এ কবিতাটি লিখে পড়িয়েছেন,

১. যে ব্যক্তি আখেরাতের উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করেছে, সে আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে সফলকাম হয়েছে।

২. অতএব, দেখুন এর ক্ষতিকর দিক যে ব্যক্তি মানুষের কাছে সম্মান পাওয়ার উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করেছে। (তালিমুল মুতাআল্লিম)

এমন ভাবে নিয়ত কে খাঁটি করতে হবে যে, ইলম অর্জনের দ্বারা শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাত পাওয়া।

যখন শিক্ষাদান পরিচালনা করা এবং অন্য কিছু করার মাধ্যমে মানুষের উপকার করার জন্য কোন ব্যক্তির নিয়ত হবে সনদপত্র পাওয়া, তখন এটি হবে খাটে নিয়ত। কোন কিছু এটির ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা এটি প্রকৃত নিয়ত।

ইলম অন্বেষণের দ্বারা আল্লাহর আদেশ মেনে চলার নিয়ত করা একজন শিক্ষার্থীর উপর অপরিহার্য। (কিতাবুল ইলম)

নিয়ত শুধু ইলম অর্জনের শুরুতেই না বরং পুরো শিক্ষাজীবনে ঠিক রাখতে হয়। কারণ সময়ের সাথে সাথে নিয়ত নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
ইলম অর্জনে যদি "আমি ভালো মানুষ হবো" এমন উদ্দেশ্য থাকে, সেটাও আল্লাহর জন্য হতে হবে, নাহলে সেটা দুর্বল হয়ে যায়।

ইলম অর্জনের ভিত্তি হলো নিয়ত। নিয়ত যদি সঠিক হয়, তবে অল্প ইলমও অনেক বড় বরকত নিয়ে আসে। আর নিয়ত যদি নষ্ট হয়, তবে বড় ইলমও মানুষের বিরুদ্ধে প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই ইলম অর্জনের শুরুতেই নিজের নিয়তকে পাকাপোক্ত করে নিতে হবে।

পড়ার নিয়মবিধি:

পড়াশোনার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিটিকে আমি সবচেয়ে বেশি ফলদায়ক মনে করি, তা হলো পুরো বইয়ের প্রতি একবার দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে নেওয়া। এই দ্রুত পাঠ করার মাধ্যমে বইটির সামগ্রিক বিষয়বস্তু, অধ্যায়গুলোর বিন্যাস, আলোচনার ধারা এবং গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা তৈরি হয়। এতে পরবর্তীতে গভীরভাবে পড়ার সময় বিষয়গুলো বোঝা অনেক সহজ হয়ে যায়।

এরপর ধীরে ধীরে প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ গভীরভাবে বুঝে পড়বে। শুধু পড়া নয়, বরং অর্থ, উদ্দেশ্য এবং মূল বক্তব্য অনুধাবন করার চেষ্টা করবে। একা একা পড়ার সময় হাতে একটি কালার কলম রাখা উত্তম। গুরুত্বপূর্ণ বাক্য, সংজ্ঞা, মূল পয়েন্ট এবং

উদাহরণগুলো আলাদা আলাদা রঙে চিহ্নিত করে রাখবে। এতে পরবর্তীতে রিভিশন করার সময় দ্রুত মনে পড়ে যাবে।

এছাড়া পরিচ্ছেদগুলোকে তীর চিহ্ন, দাগ বা ছোট নোট দিয়ে আলাদা করে রাখা উচিত, যাতে পুরো অধ্যায়ের কাঠামো চোখের সামনে পরিষ্কার থাকে। এই কাজগুলো শেষ করার পর অবশ্যই পুরো বিষয়টি পুনরায় একবার পর্যালোচনা করবে। রিভিশন হলো শেখার স্থায়িত্বের মূল চাবিকাঠি।

তুমি বইটা হাতে নিয়ে খোলা রাস্তা, গলির পথ বা শান্ত পরিবেশে হাঁটতে হাঁটতে পড়া বিষয়গুলো স্মৃতিতে পুনরায় উপস্থাপন করার চেষ্টা করবে। এই পদ্ধতিতে মনোযোগ বাড়ে এবং স্মৃতিশক্তি আরও সক্রিয় হয়।

মনে করবে তুমি সেই মুহূর্তে পরীক্ষার হলে অবস্থান করছো। প্রশ্নপত্রে যে বিষয়গুলো এসেছে, সেগুলো তুমি পূর্বেই পড়েছো এবং এখন মনে মনে উত্তর দিচ্ছো।

যদি দেখো সবগুলো উত্তর তুমি সুন্দরভাবে মনে করতে পারছ, তাহলে বুঝবে তোমার পড়া সার্থক হয়েছে এবং তথ্যগুলো মস্তিষ্কে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। আর যদি কিছু অংশ মনে না থাকে, তাহলে বই খুলে তা দেখে নেবে এবং পুনরায় মনে করার চেষ্টা করবে।

বিশেষভাবে তুমি যে বাক্যগুলো মার্ক করেছো, সেগুলো বারবার ভালোভাবে দেখে নিবে। ভুলে যাওয়া অংশগুলো আলাদা করে চিহ্নিত করে পুনরায় আত্মস্থ করার চেষ্টা করবে। আর যদি কোনো অংশ একেবারেই মনে না থাকে, তাহলে সেই পুরো পরিচ্ছেদ আবার মনোযোগ দিয়ে পড়ে নিবে।

আরবি বই পড়ার ক্ষেত্রে আরবি ভাষার ব্যাকরণ (নাহু সরফ) জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য। কারণ আরবি ভাষা একটি গভীর ও গঠনমূলক ভাষা, যেখানে একটি শব্দের পরিবর্তনে অর্থ সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে।

একজন পাঠককে আরবি ব্যাকরণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। বিশেষ করে শব্দের গঠন, বাক্যের কাঠামো, ইরাব এবং শব্দের প্রসঙ্গ অনুযায়ী অর্থ বোঝার দক্ষতা থাকা জরুরি।
যেসব ব্যাকরণগত জ্ঞান না থাকলে অর্থের বিকৃতি ঘটতে পারে, সেগুলো অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে শিখতে হবে। কারণ সামান্য ভুল বোঝার কারণে অনেক সময় পুরো বক্তব্যের অর্থই পরিবর্তিত হয়ে যায়, যার ফলে ভুল ব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

“বই পড়তে আমার ভালো লাগে না” এই ধরনের ধারণা নিজের মনে কখনোই স্থায়ীভাবে বসতে দেওয়া উচিত নয়। আবার অনেকেই বলে, “আমি বই পড়তে পারি না, বই খুললেই আমার ঘুম পেয়ে যায়।” এটি একটি সাধারণ সমস্যা, যা প্রায় অনেক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

এই অবস্থার কারণে পড়ার প্রতি অনাগ্রহ, বিরক্তি এবং ক্লান্তি সৃষ্টি হয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এটি কোনো স্থায়ী সমস্যা নয়। সঠিক অভ্যাস, নিয়মিত অনুশীলন এবং উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করলে এই সমস্যাগুলো সহজেই দূর করা সম্ভব।
তাই নিজের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা জরুরি যে, এই বাধাগুলো অতিক্রম করা সম্ভব। ধীরে ধীরে মনোযোগ বাড়বে, পড়ার প্রতি আগ্রহ তৈরি হবে এবং শেখার গতি বৃদ্ধি পাবে। যদিও এই পদ্ধতিকে অনেকেই অনুপ্রেরণামূলক মনে করে, কিন্তু বাস্তবে এটি একটি পরীক্ষিত ও কার্যকর শিক্ষণ পদ্ধতি।

একটি সুসংগঠিত দৈনন্দিন পড়ার রুটিন তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে বিভিন্ন বিষয়কে সময় অনুযায়ী ভাগ করে নিতে হবে, যেমন: ইসলামিক স্টাডিজ, গণিত, ভাষা, বিজ্ঞান ইত্যাদি।

কখনো যদি কোনো একটি বিষয় পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে যাও, তখন অবশ্যই বিষয় পরিবর্তন করবে। উদাহরণস্বরূপ, তুমি যদি দীর্ঘ সময় অংক করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ো, তখন তুমি ইতিহাস বা সাহিত্য পড়া শুরু করতে পারো।
এই ধরনের পাঠ পরিবর্তন মস্তিষ্কের একঘেয়েমি দূর করে, মনকে সতেজ রাখে এবং পড়ার আগ্রহ পুনরায় ফিরিয়ে আনে।

প্রথমে তোমাকে নিজেকে ভালোভাবে জানতে হবে। এরপর বুঝতে হবে তোমার শেখার পদ্ধতি কোনটি সবচেয়ে বেশি কার্যকর।
কারণ প্রত্যেক ছাত্র একরকম নয়। কেউ শিক্ষক থেকে শুনে দ্রুত শিখতে পারে, আবার কেউ নিজে নিজে পড়ে ভালোভাবে বুঝতে পারে। কেউ লিখে পড়লে মনে রাখতে পারে, আবার কেউ চিত্র বা উদাহরণে সহজে বুঝে।

অনেক ছাত্র আছে যারা শিক্ষকের পাঠদানের পর তা ঠিকভাবে মনে রাখতে পারে না, কিন্তু নিজে নিজে পড়লে তাদের মস্তিষ্কে বিষয়গুলো স্থায়ীভাবে গেঁথে যায়। আবার অনেকে আছে যারা একা পড়তে পারে না, কিন্তু অন্যের ব্যাখ্যা শুনলে দ্রুত শিখে ফেলে।

অতএব, নিজের উপযোগী শেখার স্টাইল খুঁজে বের করা সফলতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।
প্রতিটি পাঠ শেষ করার পর কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নেওয়া উচিত। এই বিরতি মস্তিষ্ককে পুনরায় শক্তি জোগায় এবং শেখা তথ্যগুলোকে স্থায়ী করতে সাহায্য করে।

অনেকে মনে করে একই বিষয় বারবার পড়লেই তা ভালোভাবে মুখস্থ হবে। কিন্তু অতিরিক্ত পুনরাবৃত্তি অনেক সময় ক্লান্তি, বিরক্তি এবং মনোযোগ হ্রাস ঘটায়।

এটি অনেকটা এমন একজন ফটোগ্রাফারের মতো, যে ছবি তোলে কিন্তু ক্যামেরার ফিল্ম পরিবর্তন করে না। ফলে নতুন ছবিও নষ্ট হয়, পুরনোটিও ঠিকভাবে সংরক্ষিত হয় না। একইভাবে অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তি পড়াশোনার কার্যকারিতা কমিয়ে দিতে পারে।

ছাত্রদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত ধারাবাহিক চেষ্টা, পরিশ্রম এবং ধৈর্যের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করা। কোনো অবস্থাতেই হতাশ হওয়া বা হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

কোনো বিষয় বুঝতে সমস্যা হলে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া উচিত। কারণ অনেক সময় দেখা যায়, পড়ার টেবিলে মন না বসার একটি বড় কারণ হলো পূর্বে পড়া বিষয়টি ঠিকভাবে না বোঝা বা অসম্পূর্ণ ধারণা থাকা।

এই ক্ষেত্রে আমরা যদি উলামায়ে কেরামদের জীবনের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাই যে, তাঁরা জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে সর্বদা বিনয়ী এবং আল্লাহর সাহায্যপ্রার্থী ছিলেন।

যখন তাঁদের কাছে কোনো মাসআলা বা জ্ঞানগত বিষয় কঠিন মনে হতো, তখন তাঁরা আল্লাহর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিতেন এবং তাঁর কাছেই সাহায্য কামনা করতেন।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ এরকম কোনো কঠিন বিষয়ের সম্মুখীন হলে আল্লাহ তায়ালার কাছে সাহায্য কামনা করতেন এবং বলতেন,
“হে ইবরাহিমকে ইলম দানকারী! আপনি আমাকে ইলম দান করুন। হে সুলাইমানকে বুঝ দানকারী, আপনি আমাকে বুঝ দান করুন।”
এই দোয়া আমাদের শেখায় যে, ইলম শুধুমাত্র পরিশ্রমের ফল নয়, বরং আল্লাহর দান ও তাওফিকের মাধ্যমেও অর্জিত হয়।
যখনই কোনো সমস্যায় পড়বে, তখন ধৈর্য ধরে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করবে। কারণ জ্ঞান অর্জনের পথে সফলতা শুধু বই, শিক্ষক বা পরিশ্রমের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং আল্লাহর তাওফিক ও রহমতের উপরও সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল।

অতএব, চেষ্টা, নিয়মিত অনুশীলন, সঠিক পদ্ধতি এবং আল্লাহর উপর ভরসা এই চারটি বিষয় একসাথে থাকলে একজন ছাত্র অবশ্যই সফল হতে পারে।
(তালিবুল ইলমদের সমীপে উলামায়ে কেরামের হৃদয় নিংড়ানো নসিহত)

ইলম অর্জনের সময় সম্পর্কে:

একজন মুসলিম যতই ব্যস্ত থাকুক না কেন, ইলমে দ্বীন অধ্যয়নের জন্য অবশ্যই কিছু নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা উচিত। কারণ দ্বীনি জ্ঞান শুধু একটি ঐচ্ছিক বিষয় নয়; বরং

এটি জীবনের সঠিক দিকনির্দেশনা, ইবাদতের বিশুদ্ধতা এবং হালাল-হারাম বুঝার মূল ভিত্তি।

ইসলামের সকল বিধি বিধান, হুকুম আহকাম, মুআমালাত (লেনদেন), মুআশারাত (সামাজিক আচরণ) এবং ইবাদত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জরুরি। তাই জীবনের ব্যস্ততার মাঝেও এই গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানের জন্য সময় বের করা আবশ্যক, যাতে সে এগুলোর নিয়মিত চর্চা করতে পারে।(ব্যস্ততার এই যুগে ইলম অন্বেষণ)

দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত সম্পূর্ণ জীবনটাই ইলম অর্জনের সময়। অর্থাৎ, জ্ঞান অর্জনের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই; বরং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষ শিখতে থাকে।

ইতিহাসে দেখা যায়, অনেক আলেম দেরিতে হলেও ইলম অর্জন শুরু করেছেন। যেমন, হাসান বিন জিয়াদ আশি বছর বয়সে ফিকহ অর্জন শুরু করেছিলেন। তাঁর জীবনের এই দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে যে, ইলম অর্জনের জন্য বয়স কখনো বাধা নয়।
তিনি প্রায় ৪০ বছর পর্যন্ত বিছানায় রাত্রি যাপন করেননি। এরপর তিনি আরও ৪০ বছর পর্যন্ত ফতোয়া দান করেছেন এবং মানুষের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। এটি ইলমের প্রতি তাঁর গভীর নিষ্ঠার একটি অনন্য উদাহরণ।
ইলম অর্জনের শ্রেষ্ঠ সময় হলো যৌবনের প্রারম্ভিক কাল। কারণ এই সময়ে স্মৃতি শক্তি শক্তিশালী থাকে, মনোযোগ বেশি থাকে এবং শেখার গতি তুলনামূলক দ্রুত হয়। এছাড়াও সাহরি, ফজর পরবর্তী সময়, মাগরিব ও এশার মাঝের সময়কে পড়াশোনার জন্য অত্যন্ত উপযোগী সময় হিসেবে গণ্য করা হয়।
শিক্ষার্থীর উচিত সর্বদা লেখাপড়ার মধ্যে ব্যস্ত থাকা এবং সময়কে অযথা নষ্ট না করা। যদি কোনো একটি বিষয় নিয়ে বিরক্তি বা ক্লান্তি অনুভব হয়, তখন অন্য একটি বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকা উচিত। এতে মনোযোগ পুনরায় ফিরে আসে এবং পড়ার আগ্রহ বজায় থাকে।

এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। তিনি যখন কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে অনীহা বোধ করতেন, তখন বলতেন কবিগণের

কাব্য সংকলন নিয়ে এসো। অর্থাৎ তিনি বিষয় পরিবর্তন করে মনোযোগ পুনরুদ্ধার করতেন।

ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান রহিমাহুল্লাহ রাতে দীর্ঘ সময় জেগে থাকতেন এবং ইলম চর্চা করতেন। তিনি নিজের কাছে বিভিন্ন প্রকার ফাইল ও কিতাব রাখতেন। যখন কোনো একটি বিষয় নিয়ে বিরক্তি বোধ করতেন, তখন অন্য একটি কিতাব বা বিষয়ের দিকে মনোযোগ দিতেন।

তিনি নিজের নিকট পানিও রাখতেন এবং ঘুমের ভাব হলে সেই পানি দ্বারা সতেজ হতেন। তিনি বলতেন, নিদ্রা আসে শরীরের উত্তাপ থেকে, তাই পানির মাধ্যমে শরীর ঠান্ডা রাখতে হয় এবং সতর্ক থাকতে হয়। (তালিমুল মুতাআল্লিম)
বহু গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা ইবনুল জাউযী রহিমাহুল্লাহ সময়কে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতেন। তিনি বলেন, আমি লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করতাম শুধুমাত্র প্রয়োজন অনুভব করলে। বিশেষ করে অপ্রয়োজনীয় আড্ডা এবং বেকার লোকদের সাথে সময় নষ্ট করাকে তিনি এড়িয়ে চলতেন।

কেউ সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি যথাসম্ভব কম কথা বলতেন, যাতে দীর্ঘ আলাপচারিতার মাধ্যমে তার মূল কাজ বিঘ্নিত না হয়। মানুষের সাথে সাক্ষাতের সময়টাতেও তিনি ছোটখাটো এমন কাজ করতেন, যেগুলোতে বেশি মেধা ব্যয় করতে হয় না যেমন: কাগজ কাটা, কলম তৈরি করা, বা কপি প্রস্তুত করা। এভাবে তিনি প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাতেন।

তিনি কখনো কিতাব পাঠ করতে গিয়ে বিরক্ত হতেন না। কোনো নতুন কিতাব পেলে তিনি এতটাই আনন্দিত হতেন যে, মনে হতো তিনি বিশাল ধনভাণ্ডার পেয়ে গেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে ইলম ছিল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।

এ কথা বললে সম্ভবত বাড়িয়ে বলা হবে না যে, তিনি বিশ হাজার খণ্ডের বেশি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন। তবুও তাঁর ইলম অর্জনের আগ্রহ কখনো কমেনি; বরং তিনি আরও বেশি গ্রন্থ পাঠ করার প্রতি সদা আগ্রহী ছিলেন। (শিক্ষার্থীর অমূল্য পাথেয়)

মানুষ যখন মূল কিতাব থেকে সরাসরি ইলম অর্জন করতে যায়, তখন দীর্ঘ সময়, ধৈর্য এবং কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় বলে মনে করে। অনেক সময় মানুষ তার কাঙ্ক্ষিত জ্ঞানের স্তরে পৌঁছাতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

কখনো কখনো অধিকাংশ মানুষ এই প্রতিবন্ধকতার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। বিশেষ করে যখন সে দেখে চারপাশে অনেকেই অলসতা, অকারণ আড্ডা ও সময় নষ্টে ব্যস্ত, তখন তার মধ্যেও অলসতা প্রবেশ করে।
এর ফলে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, মানসিক ক্লান্তি বাড়ে এবং পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ কমে যায়। ধীরে ধীরে সে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যায়, যদিও সে মূলত জ্ঞান অর্জন করতে চেয়েছিল। (কিতাবুল ইলম)
ইলম অর্জন কোনো সাধারণ কাজ নয়; এটি একটি ধারাবাহিক সাধনা, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং সময় ব্যবস্থাপনার সমন্বিত প্রক্রিয়া। যে ব্যক্তি নিজের সময়কে মূল্য দেয়, আল্লাহর উপর ভরসা করে এবং আলেমদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, তার জন্য ইলম অর্জনের পথ সহজ হয়ে যায়।

জ্ঞান অর্জনের পথে ধৈর্য, নিয়মিত অধ্যবসায় এবং আল্লাহর সাহায্য এই তিনটি বিষয়ই মূল চাবিকাঠি।

চেষ্টা, অধ্যবসায় ও দৃঢ় সংকল্প:

শিক্ষার্থীদের জন্য ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে চেষ্টা, অধ্যবসায় এবং দৃঢ় সংকল্পের কোনো বিকল্প নেই। শুধু ইচ্ছা থাকলেই জ্ঞান অর্জন হয় না; বরং এর জন্য নিয়মিত পরিশ্রম, ধৈর্য এবং অবিচল মানসিকতা প্রয়োজন।

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করেছেন,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

যারা আমার পথে চেষ্টা সাধনা করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহের দিকে পরিচালিত করবো। (সূরা আনকাবুত – ৬৯)

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, চেষ্টা ও সাধনা ছাড়া আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত ও ইলমের পথ উন্মুক্ত হয় না।

আরো বলা হয়েছে,

يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ

হে ইয়াহইয়া! কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো। (সূরা মরিয়ম – ১২)

এই নির্দেশনা শুধু নবীদের জন্য নয়; বরং সকল তালিবুল ইলমের জন্য একটি মৌলিক শিক্ষা দৃঢ়তা ও শক্তভাবে জ্ঞান আঁকড়ে ধরা।

বর্ণিত আছে, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো কিছু অর্জনের ইচ্ছা করে এবং সাথে সত্যিকারের চেষ্টা করে, তাহলে সে অবশ্যই তা অর্জন করে। আর যে ব্যক্তি দরজায় বারবার কড়া নাড়ে এবং অবিচল থাকে, একসময় তার জন্য দরজা খুলে যায়।

আরো বলা হয়েছে যে পরিমাণ তুমি কষ্ট করবে, সে পরিমাণই তুমি তোমার আকাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করবে।

ইলম ও ফিকহ অর্জনের জন্য তিন শ্রেণির মানুষের চেষ্টা প্রয়োজন:

১. শিক্ষার্থী

২. শিক্ষক

৩. পিতা, যদি তিনি জীবিত থাকেন

অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন একটি সম্মিলিত প্রক্রিয়া এতে ব্যক্তিগত চেষ্টা, শিক্ষকের দিকনির্দেশনা এবং পারিবারিক সহযোগিতা একসাথে কাজ করে।

মহান ইমাম শায়েখ সদীদ উদ্দিন আস সিরাজি রহিমাহুল্লাহ আমাকে ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ এর কবিতা পড়িয়ে শুনিয়েছেন,

১. চেষ্টা প্রত্যেক দূরবর্তী বস্তুকে নিকটে এনে দেয় এবং চেষ্টা সকল বন্ধ দরজা খুলে দেয়।

২. আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে দুঃখী, যার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, কিন্তু তাকে অভাবপূর্ণ জীবন দ্বারা পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে।

৩. এটি আল্লাহর ফায়সালা ও তাকদিরের প্রমাণ যে, অনেক সময় বুদ্ধিমানরা থাকে অভাব অসুবিধায়, আর নির্বোধরা থাকে স্বচ্ছলতায়।

৪. তবে প্রকৃত সত্য হলো, যাকে বুদ্ধিমত্তা দান করা হয়েছে, তাকে অনেক সময় সম্পদ থেকে কিছুটা বঞ্চিত করা হয়। বুদ্ধিমত্তা ও সম্পদ অনেক ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী হতে পারে।

এ কথাটি সাধারণভাবে বলা হয়েছে, তবে বাস্তবে দেখা যায়, আল্লাহ তায়ালা অনেক মানুষকে বুদ্ধিমত্তা ও সম্পদ একসাথে দান করেছেন এবং তারা উভয়ের সঠিক ব্যবহার করেছেন।

এর উজ্জ্বল উদাহরণ হলো ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি সম্পদশালী ছিলেন বলেই তাঁকে গনী উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। তাঁর সম্পদ তিনি ইসলামের খেদমতে ব্যয় করেছেন। প্রত্যেক যুগেই এমন কিছু মানুষ থাকেন, যারা বুদ্ধি ও সম্পদ উভয়টিকেই সঠিকভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হন।

আমাকে আরো কিছু কবিতা শোনানো হয়েছে—

১. তুমি কষ্ট ব্যতীত একজন ফকিহ হওয়ার আশা করছ? জেনে রেখো, এটা এক ধরনের অসম্ভব কল্পনা বা পাগলামির একটি রূপ।

২. কষ্ট ছাড়া সম্পদ অর্জন করা যায় না, তাহলে কিতাব পড়া ছাড়া কিভাবে ইলম অর্জিত হবে?

আবু ত্বায়্যিব মুতানব্বী বলেন,

কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম লোকদের অলসতার মতো মারাত্মক দোষ মানুষের মাঝে আমি আর দেখিনি।

একজন যোগ্য মানুষ যখন অলস হয়ে যায়, তখন তার সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়।

শিক্ষার্থীর জন্য কিছুটা রাত জেগে পড়া আবশ্যক। যেমন কবি বলেছেন,

১. কষ্ট অনুসারে উন্নতি অর্জিত হয়। যে উন্নতি কামনা করে, তার উচিত রাতে জাগরণ করা।

২. তুমি সম্মান কামনা করছো অথচ রাতে ঘুমিয়ে রয়েছো তুমি কি জানো না, মুক্তা সংগ্রহ করতে হলে সাগরে ডুব দিতে হয়?

৩. উন্নত সংকল্পের মাধ্যমে উচ্চ সম্মান অর্জিত হয়। মানুষের প্রকৃত মর্যাদা রাত জাগরণের মধ্যেই প্রকাশ পায়।

৪. যে কষ্ট ছাড়া উন্নতি আশা করে, সে অসম্ভব কিছুর পেছনে জীবন নষ্ট করছে।
৫. হে আমার সৃষ্টিকর্তা! তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই আমি রাতের ঘুম ত্যাগ করেছি।
৬. অতএব আমাকে ইলম অর্জনের তাওফিক দান করুন এবং আমাকে উন্নতির চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছে দিন।

আরো বলা হয়েছে, রাতকে উট বানিয়ে নাও, তাহলে তুমি তোমার আকাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে। অর্থাৎ যেমন উট মানুষকে দূরের গন্তব্যে পৌঁছে দেয়, তেমনি রাতের সময়কে ব্যবহার করে মানুষ ইলমের উচ্চ স্তরে পৌঁছাতে পারে।
গ্রন্থকার বলেছেন, ঘটনাক্রমে একটি কবিতা আমার স্মরণে এসেছে,

১. যে তার সমুদয় আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চায়, তার উচিত রাতকে বাহন (উট) বানানো।
২. বন্ধু! পূর্ণতায় পৌঁছাতে চাইলে আহার কমাও, যাতে রাতে জাগ্রত থাকতে পারো।
যে ব্যক্তি রাতে জেগে থাকে, দিনে তার অন্তর আনন্দিত থাকে। শিক্ষার্থীর উচিত রাতের শুরু ও শেষভাগে তাকরার ও অধ্যয়নের প্রতি অবিরাম গুরুত্ব দেওয়া। বিশেষ করে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময় এবং সেহরির সময় বরকতময় সময় হিসেবে গণ্য।

এ প্রসঙ্গে একটি কবিতা উল্লেখ আছে—
১. হে শিক্ষার্থী! তাকওয়ার সঙ্গী হও, অধিক নিদ্রা বর্জন করো এবং অতিরিক্ত আহার থেকে বিরত থাকো।
২. পড়াশোনার উপর দৃঢ়ভাবে লেগে থাকো, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। কারণ ইলম অর্জন এই পথেই উন্নত হয়েছে।
শিক্ষার্থীর উচিত তারুণ্য ও যৌবনের সূচনাকালকে গনিমত (অমূল্য সুযোগ) মনে করা। কারণ এই সময় হলো শক্তি, স্মৃতি এবং মনোযোগের সর্বোত্তম সময়। যেমন বলা হয়েছে,

১. কষ্ট অনুপাতে তোমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু দান করা হবে। যে সফলতা চায়, সে রাত জাগরণ করে।

২. তারুণ্যকে এমনভাবে গ্রহণ করো যেন তা বিনা কষ্টে প্রাপ্ত এক অমূল্য সম্পদ। জেনে রেখো, তারুণ্য চিরস্থায়ী নয়।

নিজেকে অতিরিক্ত ক্লান্ত ও দুর্বল করে ফেলো না, যাতে পড়াশোনা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। বরং সর্বক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো। কারণ মধ্যপন্থা ও কোমলতা সকল কাজের একটি মৌলিক ভিত্তি। (তালিমুল মুতাআলিম)

ইলম অর্জন একটি দীর্ঘমেয়াদী সফর, যেখানে চেষ্টা, ধৈর্য, রাত জাগরণ, সময় ব্যবস্থাপনা এবং আল্লাহর উপর ভরসা সবকিছু একসাথে প্রয়োজন।

৭) সমসাময়িক ও আধুনিক টপিক

ডিজিটাল যুগে ইলম অর্জন:

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আধুনিক এসব যন্ত্র কেন দান করেছেন? কেন এগুলো আমাদের জন্য সহজলভ্য করলেন? নিঃসন্দেহে এর পেছনে রয়েছে গভীর হিকমত। তিনি চান, মানুষ যেন সময়, সুযোগ এবং দূরত্বের বাধাকে অতিক্রম করে ইলম অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে পারে। যেন জ্ঞান শুধু নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না থাকে, বরং সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যায়।

আমাদের কাছে বর্তমানে অসংখ্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস রয়েছে। একসময় যেখানে জ্ঞান অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট মজলিস, নির্দিষ্ট কিতাব এবং নির্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজন হতো, এখন সেই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। টেপ রেকর্ডার, অডিও টেপ, সিডি, ভিসিডি, বিভিন্ন ধরনের প্লেয়ার এসব ছিল আগের যুগের মাধ্যম। সময়ের সাথে সাথে এগুলোর জায়গা দখল করেছে আধুনিক প্রযুক্তি। এখন এমপি থ্রি-এর মাধ্যমে আমরা যেকোনো দারস, বয়ান বা নসিহত সহজেই শুনতে পারি। আবার এমপি ফোর বা ভিডিও ফরম্যাটে থাকলে আমরা চাক্ষুষভাবেও তা দেখতে পারি। গাড়িতে বসেই, রাস্তায় চলতে চলতে, কিংবা কাজের ফাঁকে সব অবস্থাতেই ইলম অর্জনের সুযোগ এখন সহজ হয়ে গেছে। এফএম রেডিও, অনলাইন স্ট্রিমিং, লাইভ দারস সবই এখন আমাদের নাগালের মধ্যে।

বর্তমান যুগে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে স্মার্টফোনের মাধ্যমে। হাতে থাকা ছোট্ট একটি টাচ স্ক্রিন ডিভাইস এখন যেন পুরো পৃথিবীর জ্ঞানভান্ডারের দরজা খুলে দিয়েছে। আঙুলের একটি স্পর্শেই আমরা হাজারো ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে পারি, লক্ষ লক্ষ কিতাব পড়তে পারি, এবং অসংখ্য দারস শুনতে পারি। এখন এমন অনেক অ্যাপ ও সফটওয়্যার রয়েছে যেখানে সম্পূর্ণ লাইব্রেরি সংরক্ষিত থাকে।

এভাবে দেখা যায়, পুরো দুনিয়া যেমন, এই ডিভাইসগুলোর মধ্যে প্রবেশ করেছে, ঠিক তেমনি ইলমের বিশাল সমুদ্রও এখন এই প্রযুক্তির ভেতরেই সংরক্ষিত হয়ে গেছে। ইলম এখন আর শুধু আলেমদের হাতে লেখা কিতাবেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা ডিজিটাল আকারে সবার জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেছে।

এছাড়াও রয়েছে বিশেষ ইলেকট্রনিক বই বা ই-রিডার ডিভাইস, যেমন অ্যামাজন কাইন্ডল। এগুলো খুব সহজে হাতে বহন করা যায়। অসংখ্য বই একসাথে রাখা যায়, এবং দিনের আলো বা সূর্যের তীব্র আলোতেও এগুলোতে পড়তে কোনো অসুবিধা হয় না। এটি আমাদের অধ্যয়নের অভ্যাসকে আরও সহজ ও গতিশীল করে তুলেছে।

এই মনিটরসমৃদ্ধ ডিভাইসগুলো দিন দিন আরও উন্নত হচ্ছে। এমন প্রযুক্তির কথা শোনা যাচ্ছে, যেখানে স্ক্রিন ভাঁজ করা যাবে, রোল করে রাখা যাবে, এমনকি খুব শীঘ্রই এমন ডিভাইস আসতে পারে যা হাতের কব্জিতে পরিধান করা যাবে। প্রযুক্তি যেন ক্রমেই ক্ষুদ্র কিন্তু শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

তবে মনে রাখতে হবে ইলম মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে এক নূর, আর এসব যন্ত্র কেবল মাধ্যম। মাধ্যম কখনো উদ্দেশ্য নয়। এগুলো আমাদের জন্য ইলম অর্জনের পথকে সহজ করেছে মাত্র। যে ব্যক্তি এগুলো যেভাবে ব্যবহার করবে, সে সেই অনুযায়ী ফল লাভ করবে। যদি কেউ এগুলো কল্যাণের পথে ব্যবহার করে, তবে তা তার জন্য রহমত হবে। আর যদি অপব্যবহার করে, তবে তা তার জন্য ক্ষতির কারণও হতে পারে।
তাই আমাদের উচিত, এসব আধুনিক প্রযুক্তিকে ইলম অর্জনের কাজে সর্বোচ্চভাবে ব্যবহার করা। বিশেষ করে দ্বীনি ইলম, কুরআন, হাদিস, ফিকহ ও অন্যান্য জ্ঞান অর্জনে এগুলোকে কাজে লাগানো জরুরি।

বর্তমানে অসংখ্য ওয়েবসাইট, অ্যাপ এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, যেখান থেকে অডিও, ভিডিও, পিডিএফসহ নানা ধরনের শিক্ষামূলক কনটেন্ট ডাউনলোড করে রাখা যায়। এমনকি অনেক অনলাইন বিশ্ববিদ্যালয় ও ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, যেখানে বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব।

অনেক প্রতিষ্ঠান এমনও রয়েছে, যারা ধনী ছাত্রদের কাছ থেকে পাঠ্য উপকরণ সংগ্রহ করে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের কাছে সহজভাবে পৌঁছে দেয়, যাতে জ্ঞান অর্জনে কোনো বৈষম্য না থাকে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ফাঁকা সময়গুলো যেমন হাসপাতালে অপেক্ষা করা, যানবাহনের জন্য অপেক্ষা করা, অফিস বা অন্যান্য কাজের বিরতির সময় এসব সময়কে আমরা ইলম অর্জনের জন্য ব্যবহার করতে পারি। মোবাইল বা ল্যাপটপ বের করে কিতাব পড়া, দারস শোনা বা লেকচার দেখা এখন খুবই সহজ।

IPTV প্রযুক্তি, লাইভ স্ট্রিমিং এবং (VOD) সিস্টেমের মাধ্যমে এখন যেকোনো ইলমি প্রোগ্রাম সরাসরি দেখা যায় বা পরে ডাউনলোড করে রাখা যায়। প্রয়োজন অনুযায়ী যতটুকু দরকার, ততটুকুই সংগ্রহ করা সম্ভব। ক্লাউড স্টোরেজের মাধ্যমে এসব জ্ঞান সংরক্ষণ করাও এখন খুবই সহজ ও নিরাপদ।

আজ গুগল, অ্যান্ড্রয়েড, অ্যাপলসহ বিভিন্ন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এমন ডিভাইস তৈরি করেছে যার মাধ্যমে জ্ঞান অনুসন্ধান এখন কয়েক সেকেন্ডের কাজ। ছোট একটি ফোনেই এখন হাজার হাজার বই, গবেষণা, ভিডিও লেকচার সংরক্ষণ করা যায়।

ল্যাপটপ বা ডেস্কটপের বড় হার্ডডিস্কে যেমন দুই টেরাবাইট বা তার বেশি অসংখ্য কিতাব, অডিও-ভিডিও দারস এবং রেফারেন্স সংরক্ষণ করা সম্ভব। আগে যেখানে একটি লাইব্রেরির জন্য আলাদা ঘর লাগত, এখন তা একটি ছোট ডিভাইসেই সীমাবদ্ধ।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমরা এমন এক যুগে বসবাস করছি যেখানে ইলম অর্জনের সুযোগের কোনো অভাব নেই। অভাব কেবল ইচ্ছা, আগ্রহ এবং সঠিক ব্যবহারের। তাই ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে ইলম থেকে দূরে থাকা আর গ্রহণযোগ্য নয়।

বরং এই ব্যস্ততার যুগেই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ইলম অর্জন করা আমাদের জন্য আরও জরুরি হয়ে পড়েছে। কারণ, সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে, আর সুযোগও দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। (ব্যস্ততার এ যুগে ইলম অন্বেষণ)

পিডিএফ ভার্সনের বই:

আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানীতে বর্তমান যুগে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার হাত ধরে ইলম অর্জনের পথ অত্যন্ত সহজ ও বিস্তৃত হয়ে গেছে।

একসময় যেখানে একটি কিতাব সংগ্রহ করতে অনেক কষ্ট, সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হতো, আজ সেখানে একই সাথে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ বই আমাদের হাতের নাগালে চলে এসেছে। বিশেষ করে পিডিএফ ভার্সনের বইগুলো জ্ঞানপিপাসু ছাত্র, গবেষক এবং সাধারণ পাঠকদের জন্য এক বিশাল নিয়ামত হিসেবে দেখা দিয়েছে।
আজ একটি মাত্র হার্ডড্রাইভ বা ক্লাউড ড্রাইভে নতুন-পুরাতন অসংখ্য কিতাব, রেফারেন্স বই, গবেষণাপত্র ও তাফসির হাদিসের গ্রন্থ সংগ্রহ করা সম্ভব। এসবকে কম্পিউটার বা মোবাইল স্ক্রিনে খুলে যেন এক বিশাল ইসলামী বিশ্বকোষের ভাণ্ডার আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায়। এখানে শুধু পড়াই নয়, প্রয়োজন অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ অংশ হাইলাইট করা, কপি করে সংরক্ষণ করা, নোট তৈরি করা সবকিছুই সহজে করা যায়। এতে রয়েছে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা, যা পূর্ববর্তী যুগে কল্পনাও করা যেত না।

এসব প্রযুক্তি মূলত পাঠক ও গবেষকদের অধ্যয়নের পথকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। একজন গবেষক এখন খুব সহজেই অল্প সময়ে বিপুল পরিমাণ ইলমি সম্পদের অধিকারী হতে পারেন। এমন অনেক তথ্য, উদ্ধৃতি ও রেফারেন্স তিনি সংগ্রহ করতে পারছেন, যা হয়তো পূর্বে সংগ্রহ করতে তার জীবন শেষ হয়ে যেত। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা বড় বড় লাইব্রেরির দুর্লভ পান্ডুলিপি, প্রাচীন কিতাব এবং গবেষণাধর্মী গ্রন্থ এখন সামান্য সময়ের ব্যবধানে হাতের মুঠোয় চলে আসছে।

বর্তমানে যদি কোনো গবেষক কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে চান, অথবা উলামায়ে কেরামের মতামত একত্র করতে চান, কিংবা জ্ঞানের কোনো শাখা নিয়ে বিস্তর গবেষণা করতে চান তাহলে তাকে আর বইয়ের পাহাড় টেনে বেড়াতে হয় না। তাকে শুধু কম্পিউটার বা ল্যাপটপের সামনে বসে ধৈর্যসহকারে অনুসন্ধান করতে হয়। নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, সাজিয়ে নিতে হয়। এতে তিনি যেমন সময় বাঁচাতে পারছেন, তেমনি পরিশ্রম ও কষ্টের বড় অংশ থেকেও মুক্তি পাচ্ছেন।

এভাবে আধুনিক প্রযুক্তি মানুষকে এখানে-সেখানে দৌড়াদৌড়ির কষ্ট থেকে, বড় বড় বই বহন করার ঝামেলা থেকে এবং দীর্ঘ সময় ব্যয়ের কষ্টকর পরিস্থিতি থেকে অনেকাংশে মুক্তি দিয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি সৃষ্টিজগতের প্রতি আল্লাহ তায়ালার এক মহান দয়া ও করুণা। বিশেষ করে তালিবুল ইলমদের জন্য এটি এক বিরাট অনুগ্রহ, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে শরীয়তের হুকুম আহকাম ও দ্বীনি জ্ঞান অর্জনে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখে।

হাদিসে এসেছে, আল্লাহ তায়ালা যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করেন। সুতরাং একজন ছাত্রের উচিত নিজেকে সম্পূর্ণভাবে জ্ঞান অর্জনের পথে বিলিয়ে দেওয়া। যে যত বেশি ইলমের মাধ্যম গ্রহণ করবে, সে তত বেশি উপকৃত হবে। বই, কিতাব, পিডিএফ, অনলাইন ক্লাস, লেকচার সবকিছুকে সে নিজের সাথী বানাবে। এতে করে বোঝা যায়, বইয়ের সাথে তার কোনো শত্রুতা নেই; বরং বই তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। বাস্তবিক অর্থে এই পৃথিবীতে অচেনা পরিবেশে বইই মানুষকে সবচেয়ে বেশি সঙ্গ দেয়, পথ দেখায় এবং চিন্তাকে আলোকিত করে।
তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে পিডিএফ বা ডিজিটাল কপিতে অনেক সময় ভুল ত্রুটি থাকতে পারে, ভুল অনুবাদ বা অসম্পূর্ণ তথ্য থাকতে পারে। তাই প্রত্যেক তালিবুল ইলম ও গবেষকের জন্য জরুরি হলো নির্ভরযোগ্য ও মূল উৎস যাচাই করা এবং প্রয়োজনে আলেম-উলামার সহায়তা গ্রহণ করা। অন্ধভাবে কোনো তথ্য গ্রহণ করা উচিত নয়।

সবশেষে বলা যায়, এই ডিজিটাল যুগ ইলম অর্জনের জন্য এক বিশাল সুযোগ এনে দিয়েছে। তবে এই সুযোগকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোই হলো মূল সফলতা। যারা এই নিয়ামতকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যবহার করবে, ইনশাআল্লাহ তাদের জন্য এটি হবে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের মাধ্যম। (তালিবুল ইলমদের সমীপে উলামায়ে কেরামদের হৃদয় নিংড়ানো নসিহত)

আধুনিকতা ও ইলমের দূরত্ব:

বর্তমানে আমাদের সময়গুলো বিভিন্নভাবে কেটে যায়। কখনো গাড়ি নিয়ে রাস্তায় ড্রাইভ করা, কখনো রাতভর রূপালী পর্দায় চোখ আটকে রাখা। আবার কখনো বিভিন্ন ক্লাবে আড্ডা, হ্যাংআউট, অপ্রয়োজনীয় ঘোরাঘুরি এসবই যেন দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে গেছে। এতদিন পর্যন্ত আমাদের ব্যস্ততা মূলত এই সীমার মধ্যেই আবর্তিত ছিল।

কিন্তু এরপর আসলো ইন্টারঅ্যাক্টিভ টেলিভিশন, স্মার্ট ডিভাইস ও নানা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। যা এসে এই বিলাসী জীবনের বিলাসিতাকে যেন আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দিল। বিনোদনের জগৎ আরও বিস্তৃত হলো, আর মনোযোগ ছড়িয়ে পড়ল আরও অসংখ্য অপ্রয়োজনীয় দিকে।

এভাবেই বর্তমানে আমাদের অনেক ইলমি মজলিস ধীরে ধীরে জনশূন্য হয়ে যাচ্ছে। কমে গেছে ইলম পিপাসুদের সংখ্যা। এক সময় যে বিশাল বিশাল লাইব্রেরি ও গ্রন্থাগারগুলো ইলমের কেন্দ্র ছিল, আজ সেগুলো অনেক জায়গায় প্রায় জাদুঘরের মতো নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। এত বিপুল জনসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও ইলমের মারকাজগুলো অনেক ক্ষেত্রে জনশূন্যের মতোই দেখা যায়।

অথচ ইলম এমন এক সম্পদ, যা মানুষকে অনেক কিছুই দান করে কিন্তু বিনিময়ে কিছুই গ্রহণ করে না, কারও থেকে কিছু কেড়ে নেয় না। তবুও অধিকাংশ মানুষ ইলম থেকে উপকার গ্রহণ করতে চায় না। এমনকি পার্থিব জীবনে কাজে লাগবে এমন সাধারণ দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রেও অনেকের আগ্রহ দেখা যায় না। মূলত আজকের মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও মনোবল অনেকাংশে দুর্বল হয়ে গেছে। এমনকি অনেক শিক্ষকের মধ্যেও একই ধরনের শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়।

ইমাম আবুল হুসাইন আল আসাদী রহিমাহুল্লাহ এর নিকট ছাত্ররা ইলম শিখতে আসতো। তিনি তাদের পড়াতেন, দারস দিতেন। একই মসজিদে তিনি প্রায় ৫০ বছর কাটিয়েছেন। সেখানে তিনি মানুষকে দ্বীনি ইলম শিখিয়েছেন, মানব জীবনের বিবিধ সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। তার হিম্মতে কখনো ভাটা পড়েনি, মনোবল কখনো ভেঙে যায়নি। অথচ তিনিও বিভিন্ন দায়িত্ব ও ব্যস্ততার মাঝেই জীবন অতিবাহিত করতেন। তবুও তিনি ইলমের দারস নিয়মিত চালিয়ে গেছেন অবিরামভাবে, নিষ্ঠার সাথে।

অথচ আজ আমরা অপ্রয়োজনীয় ও অহেতুক কার্যকলাপে সময় ব্যয় করে ফেলি। টিভি সিরিজ, সিনেমা, ফিল্ম, বিভিন্ন একশন ও ড্রামা সিরিজের অসার কাহিনী দেখে দেখে সময় কেটে যায়। রিমোটের বোতাম টিপে টিপে এক চ্যানেল থেকে আরেক চ্যানেলে ঘুরতে ঘুরতেই দিন শেষ হয়ে যায়।

বর্তমানে পড়ালেখায় মনোযোগ সত্যিই অনেক কমে গেছে। শরয়ী কিতাব অধ্যয়নে মানুষের আগ্রহ ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। কারণ দৈনন্দিন জীবনের অদ্ভুত রুটিন আমাদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছে নানা রকম ম্যাগাজিন, উপন্যাস, টিভি প্রোগ্রাম ও সিরিজ দেখার জালে। কবি বলেন,

যখন তুমি দেখবে পাড়ার সন্তানেরা
বেড়ে উঠছে,
অথচ তারা হাতে কলমের ব্যাগ বহন
করছে না,
শাইখদের পাশে কোনো আসরে ও
তাদের বসতে দেখছো না,
যেখানে তারা সুবিন্যস্ত ভালো
কথাগুলো শুনতে পারে,
তখন তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো
এবং জেনে নাও যে, তারা হল
উশৃঙ্খল ইতর শ্রেণী,
তারা উচ্চাভিলাষকে নির্বুদ্ধিতায়
রূপান্তর করেছে।

দুনিয়ার প্রতি অত্যাধিক মগ্নতা এবং অর্থ উপার্জনের লিপ্সা আমাদের দ্বীনি ইলম অর্জনের আগ্রহকে অনেকাংশে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও আজ দ্বীনি ইলমের প্রতি আগ্রহ তুলনামূলকভাবে কমে গেছে।
হ্যাঁ, নিজেদের গড়ে তোলা এই জীবনটা এখন অনেকের কাছেই শুধু অর্থ উপার্জনের পেছনে ছুটে চলার নাম হয়ে গেছে। অর্থ সম্পদের প্রাচুর্যই যেন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য

হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ কেউ তো একাধিক চাকরি, দ্বিতীয় কর্মস্থল, তৃতীয় কর্মস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত করে ফেলছে শুধুমাত্র আয়ের পরিমাণ বাড়ানোর আশায়।

এটা সত্য যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, ঘনঘন বিলের চাপ এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি তাদের মাসিক আয়কে অনেক সময় নিঃশেষ করে দিচ্ছে। ফলে অর্থ উপার্জনের পিপাসা আজ প্রায় সবার মাঝেই গভীরভাবে বিদ্যমান। এই বিল ও প্রয়োজন মেটানোর দৌড়ে মানুষের জীবন ক্রমেই দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। জীবনধারণের পথ ও পদ্ধতিগুলো দিন দিন আরও সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ফলে জুলুম অত্যাচার, মানসিক চাপ ও শোকের পরিমাণও কেবল বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এসবের অনিবার্য পরিণতিতে জ্ঞান অর্জনের সেই আগ্রহ ও পিপাসা অনেকাংশে হ্রাস পাচ্ছে। দারিদ্র্য স্বাভাবিক জীবনের শত্রু। আর যখন জীবনে অস্থিরতা আসে, তখন হতাশ মানুষের সংখ্যা বেড়ে যায়। তখন মানুষ ইলম অর্জনে দীর্ঘসূত্রতা নামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। "করব করব" করে করা হয় না, "পড়ব পড়ব" বলে পড়া হয় না। জীবনের স্বাভাবিকতা নষ্ট হওয়ায় ছোটবেলা থেকেই ইলমের প্রতি অনেকের অনীহা ও শিথিলতা তৈরি হয়। ফলে সময়মতো সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না।
কবি বলেন,

যখন তুমি চাষ না করে
ফসল কাটার স্বপ্ন দেখবে,
বীজ বপনকালীন উদাসীনতার কারণে
তোমাকে লজ্জার মুখে পড়তে হবে।

কারো ট্রেন ছুটে গেলে সেই ট্রেনে সে আর চড়তে পারে না, তখন তা আর ফিরে আসে না। কিন্তু ইলম অর্জনের সময় কখনো পুরোপুরি শেষ হয়ে যায় না। জীবনের যেকোনো সময় ইলম অর্জন করা যায় শৈশব, যৌবন কিংবা বৃদ্ধকালেও এর দরজা খোলা থাকে।

অন্যদিকে, খারাপ লোকদের সংস্রব এবং দীর্ঘ সময় অহেতুক গল্প গুজবে ব্যয় করা দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো উপকারে আসে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হলো, অহেতুক কথা ও কাজ পরিহার করা।(সুনানে তিরমিজি – ২৩১৭, সুনানে ইবনে মাজাহ – ৩৯৭৬)

দুনিয়া বা আখিরাত কোনো ক্ষেত্রেই উপকারে আসে না এমন কাজ পরিত্যাগ করাই একজন মানুষের দ্বীনদারির সৌন্দর্য প্রকাশ করে। অপ্রয়োজনীয় কাজে জড়িয়ে পড়া, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা এবং সময় নষ্ট করা মানুষকে শৃঙ্খলা ও লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। ফলে ইলম অন্বেষণ থেকেও আমরা ধীরে ধীরে বিচ্যুত হয়ে পড়ি।
তাই ইলমের পথে প্রতিবন্ধক এই ব্যস্ততা নামক বিপদকে, এবং অহেতুক গল্প গুজব ও বিনোদনের ঘনঘটাকে আমাদের জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে। নিজেদের সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে ইলম অন্বেষণ করতে হবে, এবং অর্জিত ইলমকে নিজের আমলে পরিণত করতে হবে। (ব্যস্ততার এ যুগে ইলম অন্বেষণ)

প্রযুক্তিনির্ভর ইলম অর্জনের বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ:

বর্তমানে আমরা কম্পিউটার, স্মার্ট ডিভাইস ও ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগে বসবাস করছি। ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি নিঃসন্দেহে এক বিশাল সুযোগ তৈরি করেছে। পূর্বসূরী আলেমদের রচিত ইলমি ভাণ্ডার এখন এক ক্লিকেই সামনে চলে আসে, হাজারো কিতাব একসাথে সংরক্ষণ করা যায়, এবং মুহূর্তেই যেকোনো বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়। তবে এই সহজলভ্যতার মধ্যেই লুকিয়ে আছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ, যা অবহেলা করা মোটেও ঠিক নয়।

আজকের সমাজে একটি সাধারণ ধারণা তৈরি হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কম্পিউটার ব্যবহার করে না বা আধুনিক প্রযুক্তি থেকে উপকৃত হয় না, সে নাকি পিছিয়ে পড়া এবং জ্ঞান বুদ্ধিতেও দুর্বল। অথচ এই ধারণা সব ক্ষেত্রে সঠিক নয়। প্রযুক্তি অবশ্যই একটি

গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, কিন্তু তা কখনোই প্রকৃত জ্ঞানের মানদণ্ড হতে পারে না। বরং ইলমের প্রকৃত মানদণ্ড হলো তার গভীরতা, বিশুদ্ধতা এবং আমলের সাথে তার সম্পর্ক।
এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, এসব সফটওয়্যার, অ্যাপ্লিকেশন ও ডিজিটাল রিসোর্সের অনেক উপকারিতা রয়েছে। এগুলো ইলম অর্জনকে দ্রুত, সহজ এবং বিস্তৃত করেছে। কিন্তু শুধুমাত্র এগুলোর উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখলে এর কিছু বাহ্যিক ও আত্মিক ক্ষতির দিকও অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

এর বাহ্যিক ক্ষতির দিক হলো ডিজিটাল মাধ্যমে পাওয়া তথ্য অনেক সময় মূল উৎসের সাথে যাচাই করা না থাকলে বিভ্রান্তিকর হতে পারে। পিডিএফ, ওয়েবসাইট বা অ্যাপে থাকা তথ্য সবসময় নির্ভুল হবে এমন নিশ্চয়তা নেই। তাই মূল কিতাব, নির্ভরযোগ্য আলেম এবং প্রামাণ্য উৎসের সাথে মিলিয়ে না দেখলে ভুল বোঝার সম্ভাবনা থেকে যায়।

আর আত্মিক ক্ষতির দিক আরও গভীর। শরীয়তের ইলম অন্যান্য জ্ঞানের মতো সাধারণ তথ্যভিত্তিক জ্ঞান নয়। এটি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জ্ঞান, যেখানে শুধু তথ্য জানা যথেষ্ট নয়; বরং এর সাথে দরকার তারবিয়াত, আখলাক, আদব এবং আত্মশুদ্ধি। ইলম শুধুমাত্র মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না, বরং তা হৃদয় ও চরিত্রকেও পরিবর্তন করে।

একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার তার কাজে কম্পিউটার প্রোগ্রাম, সফটওয়্যার বা ডিজিটাল সিমুলেশনের উপর নির্ভর করে সফল হতে পারেন। কারণ তার কাজ মূলত জড় পদার্থ, কাঠামো এবং হিসাব-নিকাশের সাথে সম্পর্কিত। সেখানে আবেগ, আত্মিক সংশোধন বা নৈতিক প্রশিক্ষণের সরাসরি প্রভাব নেই।

কিন্তু দ্বীনি ইলমের শিক্ষার্থীর বিষয়টি ভিন্ন। সে শুধু পড়ে না, বরং শিখে, দেখে, শোনে এবং তার উস্তাদদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। তার শিক্ষা শুধু বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা তার জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। উস্তাদের আচার আচরণ, শিষ্টাচার, ধৈর্য, তাকওয়া সবকিছুই তার জন্য বাস্তব পাঠশালা হয়ে ওঠে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কম্পিউটার বা মোবাইলের মাধ্যমে কেউ জানতে পারে যে নামাজ ফরজ, এর দলিল কী, কোন সূরা বা হাদিসে তা এসেছে। কিন্তু সেই ডিভাইসের মধ্যে এমন কোনো রূহ বা নূর নেই যা ব্যবহারকারীর অন্তরকে আলোকিত করবে, তাকে নামাজের প্রকৃত স্বাদ অনুভব করাবে বা তার অন্তরে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করবে।

ঠিক তেমনি, ডিজিটাল মাধ্যমের এমন কোনো আত্মিক দৃষ্টি নেই যা একজন তালিবুল ইলমকে সর্বদা পর্যবেক্ষণ করবে, তাকে শুদ্ধ করবে, তার নফসকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং ধীরে ধীরে তাকে একজন পরিশীলিত, বিনয়ী ও আল্লাহভীরু মানুষে পরিণত করবে।

তাই প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক না কেন, ইলমের মূল প্রাণ হলো তারবিয়াত এবং আধ্যাত্মিক সংশোধন। প্রযুক্তি ইলম অর্জনের পথকে সহজ করতে পারে, কিন্তু ইলমের রূহ তৈরি করতে পারে না।

তাই একজন তালিবুল ইলমের উচিত প্রযুক্তিকে সহায়ক মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা, কিন্তু প্রকৃত নির্ভরতা রাখা উস্তাদ, কিতাব এবং তারবিয়াতের উপর। ইলমের সাথে আদব, আখলাক এবং আত্মশুদ্ধিকে সমান গুরুত্ব দেওয়াই হলো প্রকৃত সফলতার পথ। (শিক্ষার্থীর অমূল্য পাথেয়)

৮) ইলম, সময় ও অনীহা

জ্ঞান অর্জন সম্পর্কে:

ইলম অর্জনকারীর উচিত সর্বদা উপকার লাভে মনোযোগী থাকা। কারণ ইলম এমন এক নূর, যার আলো কখনো নিভে যায় না। একজন তালেবে ইলমের জীবনে প্রকৃত সফলতা তখনই আসে, যখন সে অবিরামভাবে জ্ঞান অর্জনের পথে অটল থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে। ইলমের ক্ষেত্রে কখনো "আমি যথেষ্ট শিখেছি" এমন ধারণা থাকতে পারে না। মানুষের বুদ্ধি, হৃদয় ও আত্মা ইলমের মাধ্যমেই শুদ্ধ, পরিপূর্ণ ও আলোকিত হয়।

আর এই উপকারিতা অর্জনের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো যেখানেই যাওয়া হোক, যেকোনো মজলিসে বসা হোক, এমনকি যেকোনো অবস্থায় সর্বদা লেখার সরঞ্জাম সাথে রাখা। কারণ একজন ইলম অর্জনকারীর কাছে এমন সুযোগ আসতেই পারে, যেখানে হঠাৎ জ্ঞানীদের মুখ থেকে অমূল্য ও উপকারী কথা বেরিয়ে আসে। এ কথা যদি তখনই লিখে না রাখা হয়, তবে পরবর্তীতে ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কলমে লিখে রাখা হলে তা চিরস্থায়ী হয়ে যায়।

উল্লেখ্য রয়েছে "যে শুধু মুখস্থ করে, তার মুখস্থ করা অদৃশ্য হয়ে যায় আর যে লিখে রাখে, তার জ্ঞান স্থায়ী ও বর্তমান থাকে।"

অর্থাৎ মুখস্থ স্মৃতি মানুষের দুর্বলতার কারণে অনেক সময় ভুলে যায়, কিন্তু লেখনী কখনো হারায় না। তাই মানুষ যা লেখে, সেটাই তার চিরস্থায়ী ইলম কারণ তা সংরক্ষিত থাকে, এবং পরে বারবার দেখে শিখে নিতে পারে।

আরো বলা হয়েছে, "জ্ঞানীদের মুখ থেকে যা নেওয়া হয়, সেটাই ইলম। কারণ তারা যতটুকু শোনে, তার চেয়ে উত্তমভাবে মুখস্থ করে, আর যতটুকু মুখস্থ করে তার থেকেও উত্তমভাবে তা প্রকাশ করে।"

আলিমদের জ্ঞান শুধু শুনে নেওয়ার বিষয় নয়, তাদের উপলব্ধি, ব্যাখ্যা, অনুধাবন ও গভীরতা থেকেও শিক্ষার্থীরা উপকৃত হয়। তাদের কথার পেছনে অভিজ্ঞতা, গবেষণা, তাদাব্বুর ও তাফাক্কুর থাকে যা একজন শিক্ষার্থীর জন্য অত্যন্ত মূল্যবান।

আমি আদীবে মোখতার নামে খ্যাত উস্তাদ শাইখ যাইনুল ইসলাম (হাফিজাহুল্লাহ) এর কাছে শুনেছি, হযরত হিলাল বিন ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,
একদিন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে ইলম ও হিকমত সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে শুনলাম। তিনি যে বাণী দিচ্ছিলেন, তা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ও উপকারী ছিল। তখন আমার মন চাইল, আমি যেন আলাদা করে সেই জ্ঞান আমার জন্যও গ্রহণ করতে পারি। তখন আমি সাহস নিয়ে বললাম "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি তাদের উদ্দেশ্যে যা বললেন, তা কি আমার জন্য আবার বলবেন?"
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,
"তোমার কাছে কি কলম আছে?"
আমি বললাম "না।"
তখন তিনি যে উপদেশ দিলেন,
"হে হিলাল! কলম থেকে তুমি বিচ্ছিন্ন হয়ো না। যারা কলম ব্যবহার করে, কল্যাণ তাদের সাথে কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।"
অর্থাৎ কলম ইলমের বাহক, কলম ইলমের রক্ষক, কলম ইলমের স্মৃতিস্তম্ভ।
যে কলমকে সঙ্গী করে, সে কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কলমের দ্বারা জ্ঞান সংরক্ষিত থাকে, ইলম বাড়ে, চিন্তা পরিপক্ক হয়, এবং পরবর্তী প্রজন্ম উপকৃত হয়।

শহীদ হুসামুদ্দীন রহিমাহুল্লাহ তার ছেলে শামসুদ্দীনকে ওসিয়ত করেছিলেন,
"প্রতিদিন ইলম ও হিকমতের সামান্য অংশ হলেও মুখস্থ করবে। কারণ ইলম ধীরে ধীরে বাড়ে এবং ক্রমাগত অনুশীলনের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে।"

তিনি বুঝাতে চেয়েছেন,
এক দিনে অনেক শিখতে না পারলেও প্রতিদিন সামান্য শিখলে দীর্ঘ একটি সময় পর তাকেই বিপুল ইলমের মালিক করে দেয়।
তবে মুখস্থ করার চেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো লেখার মাধ্যমে সেই জ্ঞান সংরক্ষণ করা।

শায়খ ইসামুদ্দীন বিন ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ ১ দিনার দিয়ে একটি কলম কিনেছিলেন এজন্য যে, উপস্থিত যা শোনা যায় তা লিখে রাখার উদ্দেশ্যে।

তৎকালীন সময়ে কলম কোন দামে বস্তু হিসেবে বিবেচিত না হলেও তিনি লেখার গুরুত্বের প্রতি লক্ষ রেখে একদিনার দিয়ে একটি কলাম কিনেছিলেন। যা বর্তমানে টাকা হিসেবে হাজার টাকার চেয়েও বেশি অর্থাৎ ছয় আনা স্বর্ণের দাম।
এটি তার ইলমপ্রেম, গুরুত্ববোধ এবং ত্যাগের প্রকৃত উদাহরণ।

ইলম অফুরন্ত, মানুষের আয়ু সীমিত।
তাই ইলম অর্জনকারীর উচিতসময়কে নষ্ট না করা, রাতকে গনীমত মনে করা, অবসরকে ইলমের খোরাক বানানো।

ইয়াহইয়া বিন মুয়াজ আল রাজী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "রাত দীর্ঘ তুমি ঘুমিয়ে এটাকে খাটো করে ফেলো না।
দিন উজ্জ্বল তোমার পাপ দিয়ে একে কলংকিত করো না।"
ইলম অর্জনকারীর উচিত গুরুজনকে গনীমত মনে করা। তাদের কাছ থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করা।
সুযোগ থাকা অবস্থায় তাদের থেকে উপকার লাভে ব্যর্থ হওয়া হলো বড় একটি ক্ষতি।

শাইখুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন রহিমাহুল্লাহ তার "মশীখা"-তে লিখেছেন ইলম ও পূর্ণতা প্রাপ্ত অনেক বড় বড় মনীষীকে পেয়েছি, কিন্তু তাদের থেকে উপকৃত হতে পারিনি। এই হারানের দুঃখে কবিতার এই লাইনটি বলছি,

"মনীষীদের পাওয়া সত্ত্বেও সাক্ষাৎ লাভ না হওয়ায় কত আফসোস পড়ছি । যা হারিয়ে এবং ধ্বংস হয়ে যায়, তার সবকিছু ফিরে পাওয়া যায় না।
জীবনে জ্ঞানীদের মূল্যায়ন করা অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,
"যখন কোনো কাজ করবে, তা মনোযোগ সহকারে করবে। লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার ইলম থেকে বিমুখ হওয়াই যথেষ্ট। রাতদিন তা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করবে। ইলম অর্জনকারীর জন্য ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে কষ্ট ও লাঞ্ছনা সহ্য ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। তোষামোদ সর্বক্ষেত্রে নিন্দনীয় হলেও ইলম

অর্জনের বেলায় নিন্দনীয় নয়। কারণ জ্ঞান লাভ করার জন্য শিক্ষক, সঙ্গী ও অন্যদের সাথে তোষামোদ করা ছাড়া উপায় নেই।
উল্লেখ্য রয়েছে, ইলমে শুধু সম্মানই রয়েছে। এতে লাঞ্ছনা বলতে কিছু নেই। তবে তা লাঞ্ছনা ছাড়া অর্জিত হয় না। এতে কোন লজ্জা নেই। কেউ একজন বলেছেন,
আমি তোমাকে দেখছি তুমি নিজের জন্য সম্মান আশা করছ। কিন্তু তুমি লাঞ্ছিত হওয়া ছাড়া সম্মান পাবে না। (আলিমুল মুতাআল্লিম)

ইলমের পথ দীর্ঘ, কিন্তু এর ফল সবচেয়ে মিষ্টি।
যে কলমকে সঙ্গী করে, সময়কে মূল্য দেয়, জ্ঞানীদের সম্মান করে। সেই ইলমের প্রকৃত স্বাদ লাভ করে এবং তার জ্ঞান কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের উপকারে আসে।

ইলম অন্বেষণে বিমুখতা:

ইলম বা জ্ঞান অর্জন মানবজীবনের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টির থেকে আলাদা করে যে গুণটি সবচেয়ে বেশি মর্যাদা দেয়, তা হলো জ্ঞান। অথচ আজকের সমাজে লক্ষ্য করা যায় অনেকেই ইলম অন্বেষণে বিমুখ হয়ে পড়ছে। এটি কেবল ব্যক্তিগত ক্ষতি নয়, বরং সামগ্রিকভাবে সমাজ ও জাতির জন্য এক গভীর সংকট।

ইলমের এর মর্যাদা ও গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও কিছু মানুষকে আমরা দেখি, তারা ইলম থেকে একেবারে বিমুখ, গাফিল, অমনোযোগী। ইলম অন্বেষণে বিমুখতার অন্যতম কারণ হলো অলসতা ও দুনিয়াবিমুখ মনোভাবের অভাব। অনেকেই মনে করে, জ্ঞান অর্জন কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ; তাই তারা সহজ পথ বেছে নিতে চায়। এছাড়া প্রযুক্তির অপব্যবহার, যেমন অপ্রয়োজনীয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সময় নষ্ট করা, মানুষকে পড়াশোনা ও জ্ঞানচর্চা থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। কেউ ব্যাবসা বাণিজ্য ও তার ভাগ বাটোয়ারা নিয়েই মহাব্যস্ত। কেউ ব্যস্ত জীবিকা উপার্জন আর অর্থ সম্পদ কামানোতে ব্যস্ত। এমন মানুষ কম নেই যারা নানান খেলতামাশায় মত্ত। কেউ সময় নষ্ট করছে ভ্রমণ ও ঘোরাফেরার পেছনে। কেউ নিজ পেশার থাকে মশগুল থাকে আবার কেউ, আবার কেউ অবসরে আনন্দ ভ্রমনে ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার মাঝেও বিভিন্ন ধরনের

গণমাধ্যম গুলো প্রতিনিয়ত কেড়ে নিচ্ছে আমাদের মূল্যবান সময়গুলোকে। টিভি, রেডিও, পেপার পত্রিকা এগুলা আমাদেরকে সারাদিন ব্যস্ত করে রাখছে। খেলাধুল, বিনোদন, বিলাসিতা এক ব্যস্ততার পর আর এক ব্যস্ততা এভাবেই আমাদেরকে মাতিয়ে তুলছে। ফলে ক্রমেই আমাদের ব্যস্ততা বেড়ে চলছে। এখনকার চিত্রটাই হচ্ছে এক ব্যস্ততার পর আর এক ব্যস্ততা। এক ব্যস্ততা সেরে উঠতে না উঠতে আরেক ব্যস্ততা এসে হাজির আমাদের ব্যস্ত করার জন্য।

এমনকি এক শিক্ষক বলেছেন, তার কিছু ছাত্র খেলাধুলায় দিনে প্রায় ১২ ঘণ্টা ব্যস্ত থাকত। একটা খেলা শেষ করে তাদের শুরু হতো আর একটা খেলা। ৪ মিলিয়ন কিশোর কিশোরীর দিনে ৬ ঘন্টার অধিক সময় শুধু ইন্টারনেটেই ব্যস্ত থাকে। এতটা সময় তারা নেটে বিভিন্ন প্রেম, গল্প, অহেতুক কিচ্ছা কাহিনী, উত্তেজিত বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট দেখাতেই লিপ্ত থাকে। আবার কেউ ঘন্টার পর ঘন্টা সময় নষ্ট করে গেম খেলতে খেলতে। অহেতুক কথাবার্তা, অহেতুক মেসেজিং একটার পর একটা তাদেরকে আবদ্ধ করে রাখে। এতকিছুর পরে তাদের ইলম অর্জন করার মত সময় থাকে না।

অনেকে বিভিন্ন গাড়ির সৌন্দর্য নিয়ে ব্যস্ত, নানা ভোগ বিদেশিতায় ব্যস্ত। শক্তি বর্ধনের জন্য বিভিন্ন জিমে গিয়ে ব্যায়াম করে। শরীরের এই শক্তি বর্ধন ইবাদতের জন্য নয় বরং এটা করে থাকে ভোগ বিলাসিতায় ডুবে থাকার জন্য। কেউ নানান ডিজাইনের পোশাক পরিচ্ছেদ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, কেউ ব্যস্ত থাকে অকারণে হাট বাজার, শপিং করাতে। অনেকেরই বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে, কফি শপে দীর্ঘ সময় নষ্ট করা একটা স্বভাবের মত পরিণত হয়েছে। সেখানে গিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অনেক লম্বা সময়। অনেক অবান্তর বিষয়বস্তুতে মত্ত থাকে সারাদিন। অনেকে দেখা যায় অঢেল সম্পত্তি অর্জন করার পরও ওকালতি বা বড় বড় পদে আসীন হওয়ার জন্য সারাদিন দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে। যাতে করে এসব পদ পদবি তাদের জন্য আরও অঢেল সম্পদের প্রাচুর্যের পথ খুলে দেয়। মোটকথা হচ্ছে, ব্যস্ত থাকার পিছনে তাদের হাজারটা মাধ্যম এবং কারণ উপস্থিত। কেউ অক কাজে ব্যস্ত আবার কেউ কাজে ব্যস্ত। অকাজের ব্যস্ততা তো সবার জন্যই বর্জনীয়। কিন্তু কাজের ব্যস্ততাকে ধরেই কথা বলি।

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ছি দেন একজন বড় ব্যবসায়ী। তবে তাদের ব্যবসা আল্লাহর জিকির, নামাজ, যাকাত, দ্বীনি ইলম অন্বেষণ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহচর্য গ্রহণ করার থেকে কখনোই তাদের গাফেল করে রাখতে পারেনি। বর্তমানে আমরাও ব্যবসা করি। সাহাবারাও ব্যবসা করতেন। কিন্তু তারা তো ইলম অর্জন থেকে নিজেকে গাফেল রাখত না। কিন্তু আমরা নিজেদের শুধু ইলম অর্জন থেকে না বিভিন্ন দ্বীনি কর্মকাণ্ড থেকেও নিজেদেরকে বিরত রাখি। ব্যবসার জন্য আল্লাহকে স্মরণ করার সুযোগই আমাদের থাকে না।

আমাদের উলামায়ে কেরামদের মধ্যে কাউকে এমন দেখা গেছে, যারা রমজান থেকে হজের মৌসুম পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে কিছু অর্থ উপার্জন করতেন। তা দিয়ে তারা নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনীয় খরচ যোগার করতেন সারা বছর জন্য। আর বছরের বাকি সময় ব্যস্ত থাকতেন ইলম অন্বেষণ করতে।

ইলম দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই পাবো। জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারব। জীবনে অনেক কিছু অর্জন করতে পারব। কিন্তু যদি আমরা ইলম অর্জন থেকে নিজেদেরকে বিমুখ করে রাখি। তাহলে কোনটাই আমরা অর্জন করতে পারব না। তাই ব্যস্ততার দোহাই না দিয়ে ইলম অর্জনের জন্য অবসর সময়কে কাজে লাগাই। ব্যস্ততাকে মাঝে মাঝে অবসর দিয়ে সাবিরা যেভাবে সময় দিয়েছেন ইলম অন্বেষণের পিছনে। তেমন আমরাও ইলম অন্বেষণে নিজেদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করি। (ব্যস্ততার এ যুগে ইলম অন্বেষণ)

অবসরতা হচ্ছে গনিমত:

মানুষের জীবনে সময়ই সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। এই সময়ের মধ্যেই লুকিয়ে আছে উন্নতি, সফলতা এবং আত্মগঠনের সকল সম্ভাবনা। বিশেষ করে অবসর সময় যে সময়টাকে আমরা প্রায়ই অবহেলা করি তা আসলে ইলম অর্জনের জন্য এক মহামূল্যবান গনিমত। যেই সময়টাতে আমরা নিজেদের দ্বীনি ইলম অর্জন করর নিজেদেরকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যেতে পারি

প্রত্যেক পেশার মানুষই সে চাকরিজীবী হোক বা ব্যবসায়ী হোক কিছু সময় অবসর পেয়ে থাকে। যখন সে বিভিন্ন ধরনের সরকারি ছুটি পায় গ্রীষ্মকালীন ছুটি, বাৎসরিক ছুটি, মাসিক ছুটি, সাপ্তাহিক ছুটি, এছাড়াও প্রত্যেক দিন কাজ শেষ হওয়ার পরের অবসর সময় গুলো থাকে তখন তো সময়ের অভাব হয় না। আবার কেউ কেউ তো কাজের ফাঁকেও অবসর সময় পেয়ে থাকে। এই অবসর সময় কেউ পত্রপত্রিকা পাঠ করে , কেউ তেলাওয়াত শোনে, কেউ তেলাওয়াত করে, কেউ গান শোনে, কেউ বিভিন্ন ধরনের নাটক সিনেমা দেখে, কেউ বিভিন্ন ইলমি বিষয় শুনে। এই সময় গুলোকে আমরা চাইলেই ইলম অর্জনের পিছনে ব্যয় করতে পারি।

ইলম অর্জনের জন্য বড় বড় সুযোগের অপেক্ষা করতে হয় না। আমরা যখন কোন কিছুর অপেক্ষায় থাকি, তখন এই সময় গুলো আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে নেয়। অথচ আমাদের একটু আফসোস হয় না। কেউ বাসের অপেক্ষায়, কেউ ট্রেনের অপেক্ষায়, কেউ বিমানবন্দরের বসে থাকে সিডিউল লেট হওয়ার কারণে। এই সময়টাতে অলস বসে না থেকে মোবাইলটা বের করে কিছু কিতাবাদি। কিছু ইলমি দারস শুনুন। এমন কিছু অ্যাপও আছে যা পূর্বের পড়া বিষয়টাকে বুকমার্ক করে রাখার অপশন আছে। যেন পুনরায় পড়তে গেলে বাকি অংশটা পড়তে পারেন।

এমনভাবে মেমোরিতে সে সকল পুস্তক সংরক্ষিত করে রাখতে পারেন যা দীর্ঘ বছর আগে পড়া হয়েছে। যাতে সেগুলো পুনরায় পড়ে আপনি তা থেকে আপনার সেই গুরুত্বপূর্ণ কিতাবগুলো থেকে উপকার অর্জন করতে পারেন। এগুলো মস্তিষ্কের ধারণ করার প্রক্রিয়াটি চালাতে পারেন। একবার উপকার নিয়ে আবার তা থেকে উপকার নিতে পারেন।

আমাদের পূর্বসূরিদের মধ্যে অনেকেই হাঁটাচলা করা অবস্থায় পড়াশোনা করতেন। আবু বকর বিন খাইয়াত আন নাহবি রহিমাহুল্লাহ সব সময় পড়ার মধ্যে লেগে থাকতেন। এমন কে রাস্তায় চলার সময়ও তিনি পড়তেন। এর ফলে অনেক সময় তিনি নদীর পাশের খাড়া ঢাল থেকে নিচে গর্তে পড়ে যেতেন।

আর আল্লামা খতিব আল বাগদাদি রহিমাহুল্লাহ রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময়ও তার হাতে কিতাবের কিছু অংশ থাকত। তিনি তা পড়তে থাকতেন।

হিলইয়াপ্রনেতা আবু নুআইম আল আসবাহানি রহিমাহুল্লাহ পাঠদানে ব্যস্ত থাকতেন। যখন দারসগাহে যাওয়া হতো এখনো তিনি পড়াতেন। আবার তিনি যখন বাড়িতে যেতেন, তখনো তাকে পরিয়ে শোনানো হতো।

রাস্তায় হেঁটে হেঁটে পড়ার কারণে তো সালাব আন নাহবি রহিমাহুল্লাহ এর মৃত্যুই ঘটে যায়। জুমার দিন আসরের পর তিনি জামে মসজিদ থেকে বের হয়ে হাঁটছিলেন। তখন তার মধ্যে কিছুটা বধিরতা কাজ করছিল। অনেক কষ্ট করেও তিনি কিছুটা শুনতে পেতেন। সে সময় তার হাতে একটু বই ছিল। যেগুলোর দিকে তিনি রাস্তায় হাঁটা অবস্থায় তাকাচ্ছিলেন। হঠাৎ এক ঘোড়া তাকে ধাক্কা দিয়ে গর্তে ফেলে দিল। পরের দিন তিনি ইন্তেকাল করেন। (ব্যস্ততার এ যুগে ইলম অন্বেষণ)

অথচ আজ আমাদের হাতে কত অজস্র সময়। তবুও আমরা নিজেদেরকে দ্বীনি ইলম অর্জন থেকে নিজেদেরকে পিছিয়ে রাখছি। অবসর সময়কে গনিমত মনে করার মানে হলো, এটিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া একটি বিশেষ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করা। কারণ, সবাই এই সুযোগের সঠিক ব্যবহার করতে পারে না। যারা পারে, তারাই জীবনে এগিয়ে যায় এবং নিজেদেরকে উন্নত করে তোলে। অবসর সময় কোনো তুচ্ছ বিষয় নয়, বরং এটি এক অমূল্য গনিমত। তাই আমাদের উচিত এই সময়কে ইলম অর্জনের জন্য ব্যবহার করা, যাতে আমরা নিজেদেরকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করতে পারি।

পরিশেষে:

দ্বীনি ইলম অর্জন মানুষের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে, সত্য মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে সহায়তা করে । ইলম মানুষের ঈমানকে শক্তিশালী করবে, আমলকে শুদ্ধ করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথকে সহজ করে দেয়। ইলম অর্জনের মাধ্যমে একজন মানুষ সঠিক জ্ঞান লাভ করে তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারে।

আমাদের ব্যক্তিজীবনে, কর্মজীবনে, সামাজিক জীবনে, আখিরাত সম্পর্কে জানতে দ্বীনি ইলম অর্জনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ইলমের মাধ্যমেই আমরা হালাল-হারামের পার্থক্য করতে পারি, আখিরাত সম্পর্কে জানতে পারি, নীতি নৈতিকতা অর্জন করতে পারি। ইলমই মানুষকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী মোহ থেকে দূরে রেখে আখিরাতের চিরস্থায়ী সুখের জন্য প্রস্তুত হতে সহায়তা করে।

বিশেষ করে এই শেষ জমানায় যখন চারদিকে ফিতনা ফাসাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে যেখানে নিজের প্রতি পদক্ষেপে ঈমানকে ধরে রাখা কঠিন। প্রতিটি পদক্ষেপে বিভ্রান্তি ও গোমরাহি। এই অবস্থাতে ইলম অর্জন ছাড়া আমাদের ঈমানকে ধরে রাখা দুষ্কর হয়ে যাবে।

ইলম হচ্ছে নবী রাসূলগণের ওয়ারিশ। তারা দুনিয়াতে কোন সম্পদ রেখে যাননি। বরং রেখে গিয়েছেন জ্ঞান। যা মানুষকে হেদায়েতের পথে পরিচালনা করে। গোমরাহী ও পথভ্রষ্টা থেকে দূরে রাখে।

ইলমই হচ্ছে ইসলামের ভিত্তি। এই ইলম অর্জনেই দাড়াই সঠিক আকিদা, শুদ্ধ আমল, নৈতিকতা অর্জন করতে পারি।

তাই আমাদের উচিত, ধৈর্যের সাথে ইলম অর্জনে সচেষ্ট হওয়া এবং নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা। কারণ ইলমই মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখায়, দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতার পথ দেখায়।